অনল-শিখা

শ্রীআদিত্যশঙ্কর

সেনগুপ্ত এণ্ড কো
৩/১এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক
অমল সেনগুপ্ত
৪০/১সি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,
কলিকাতা

তিন টাকা

...দ্রাকর
...জিতেন্দ্রনাথ দত্ত
...মীবিলাস প্রেস লিঃ
... জগন্নাথ দত্ত লেন
...কাতা—৯

—ঃ উৎসর্গ ঃ—

'যে নারী আমায় অনলের জীবনের অনিবার্য পরিণতির হাত থেকে রক্ষা করেছে এই রচনা তারই প্রাপ্য।'—

ভূমিকা

দীর্ঘদিন যন্ত্রস্থ থাকার পর "অনল-শিখা" ছাপার আকারে বেরুল। ল-শিখা যন্ত্র-যন্ত্রণার হাত থেকে কবে যে নিষ্কৃতি পেত তার কোনও শ্চয়তাই ছিল না। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে আহ্বান জানালেন সেনগুপ্ত এণ্ড কোংএর পক্ষ থেকে শ্রীঅমল সেনগুপ্ত। নূতন লেখককে এমন ভাবে আহ্বান জানাবার মধ্যে তার সহৃদয়তা এবং সৎসাহসেরই পরিচয় পেলাম। স্বীকার না করে উপায় নেই যে এই দুটি গুণের একান্তই অভাব বাঙালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে। সাহিত্য-জগতে প্রবেশ পথে অমলবাবুর এই সহৃদয়তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরিশোধনীয়ই থেকে যাবে বোধ হয়। শুধু অনল-শিখা প্রকাশের জন্য নয়—আরও আগে আমার প্রথম রচনা 'পরবাসীর' বিক্রয় ব্যবস্থার সময়ও তাঁর কাছ থেকে যে সাহায্য পেয়েছি তা আর কারুর কাছেই পাইনি। শুধু মাত্র 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' বলে যাঁরা ব্যবসা করেন বহির্জীবনে তাঁদের কোন অভাব হয়ত থাকে না। কিন্তু তাঁদের অন্তর্জীবনের দারিদ্র্য প্রায়ই চোখে পড়ে। অমল বাবুকে দেখে মনে হল, লক্ষ্মী শুধু তাঁর বাণিজ্যেই নয়, তাঁর হৃদয়ের মধ্যেও আছেন। বলাবাহুল্য এই অভিজ্ঞতা একান্ত দুর্লভ এবং আমার জীবনে এই প্রথম। তাই সর্বাগ্রে তাঁর কাছেই আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিলাম। শ্রীভগবান তাঁর মঙ্গল করুন।

অনেক কথা লেখার আছে। তাই সংক্ষেপে সব লিখতে হবে, না হলে ভূমিকা বড় হ'য়ে যাবে।

'অনল-শিখাকে' উপন্যাস বলা চলে কি না অথবা বলা গেলে একে

কোন শ্রেণীর উপন্যাস বলে গণ্য করা চলে, এ সমস্ত তত্ত্বের মীমাংসার ভার সমালোচকদের হাতে থাক। আমি শুধু অনল-শিখার সম্বন্ধে আমার বক্তব্যটুকু বলে যাই।—

আদিমতম অবস্থার মানুষ ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। কি সে পরিণতি, তার রূপটাই বা কেমন? সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যে এই বিবর্তনের এক একটা অধ্যায় শেষ কর্তে কর্তে চলেছে এই কথাটা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু, গভীর ভাবে লক্ষ্য কর্লে দেখা যায় যে, সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনে নানা জটিলতারও সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিনিয়তই। বর্তমান সভ্যতা—বৈদেশিক সভ্যতা। বিজ্ঞান মানুষের বহির্জীবনের অস্বাচ্ছন্দ্য অনেকাংশে লাঘব করেছে, কিন্তু তার জন্য যে সব উপাদান সে সৃষ্টি করেছে, তা একদিক দিয়ে বহির্জীবনের অভাবমোচন করলেও অপরদিক দিয়ে নূতনতর অশান্তির সৃষ্টি করে মানুষের জীবনটাকেই করে তুলেছে জটিলতর। তবু এ সভ্যতাকে আমরা ত্যাগও কর্তে পারি না। কারণ সে'ও এসেছে একটা নির্দিষ্ট, নিয়মের মধ্য দিয়ে। পূর্বতন সভ্যতার সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে বিচার করে আমরা আমাদের উন্নতি অবনতির হিসাব নির্ণয় করে থাকি। যখন দেখি, একের মধ্য দিয়ে অপরটি এসেছে, স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়ে অশান্তি এসেছে; তখন বুদ্ধিমানের মত দুটোকেই স্বীকার করে নিই, দুটোকেই গ্রহণ করি। পরিণতির সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাক আর নাই থাক, দুটোকেই মেনে নিই বিনা দ্বিধায়। ফলে আর যাই হোক না কেন, সাধারণ জীবনধারণের পক্ষে কোন অসুবিধা বোধ করি না। কিন্তু যারা তা পারে না, যারা অন্তর্জীবন আর বহির্জীবনের এই অসঙ্গতিটুকু কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারে না—তাদের জীবনটাই হয়ে ওঠে শোচনীয়। আলোচ্য উপন্যাসের

ভূমিকা

দীর্ঘদিন যন্ত্রস্থ থাকার পর "অনল-শিখা" ছাপার আকারে বেরুল। অনল-শিখা যন্ত্র-যন্ত্রণার হাত থেকে কবে যে নিষ্কৃতি পেত তার কোনও নিশ্চয়তাই ছিল না। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে আহ্বান জানালেন সেনগুপ্ত এণ্ড কোংএর পক্ষ থেকে শ্রীঅমল সেনগুপ্ত। নূতন লেখককে এমন ভাবে আহ্বান জানাবার মধ্যে তার সহৃদয়তা এবং সৎসাহসেরই পরিচয় পেলাম। স্বীকার না করে উপায় নেই যে এই দুটি গুণের একান্তই অভাব বাঙালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে। সাহিত্য-জগতে প্রবেশ পথে অমলবাবুর এই সহৃদয়তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরিশোধনীয়ই থেকে যাবে বোধ হয়। শুধু অনল-শিখা প্রকাশের জন্য নয়—আরও আগে আমার প্রথম রচনা 'পরবাসীর' বিক্রয় ব্যবস্থার সময়ও তাঁর কাছ থেকে যে সাহায্য পেয়েছি তা আর কারুর কাছেই পাইনি। শুধু মাত্র 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' বলে যাঁরা ব্যবসা করেন বহির্জীবনে তাঁদের কোন অভাব হয়ত থাকে না। কিন্তু তাঁদের অন্তর্জীবনের দারিদ্র্য প্রায়ই চোখে পড়ে। অমল বাবুকে দেখে মনে হল, ৺লক্ষ্মী শুধু তাঁর বাণিজ্যেই নয়, তাঁর হৃদয়ের মধ্যেও আছেন। বলাবাহুল্য এই অভিজ্ঞতা একান্ত দুর্লভ এবং আমার জীবনে এই প্রথম। তাই সর্বাগ্রে তাঁর কাছেই আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিলাম। শ্রীভগবান তাঁর মঙ্গল করুন।

অনেক কথা লেখার আছে। তাই সংক্ষেপে সব লিখতে হবে, না হলে ভূমিকা বড় হ'য়ে যাবে।

'অনল-শিখাকে' উপন্যাস বলা চলে কি না অথবা বলা গেলে একে

কোন শ্রেণীর উপন্যাস বলে গণ্য করা চলে, এ সমস্ত তত্ত্বের মীমাংসার ভার সমালোচকদের হাতে থাক। আমি শুধু অনল-শিখার সম্বন্ধে আমার বক্তব্যটুকু বলে যাই।—

আদিমতম অবস্থার মানুষ ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। কি সে পরিণতি, তার রূপটাই বা কেমন? সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যে এই বিবর্তনের এক একটা অধ্যায় শেষ কর্তে কর্তে চলেছে এই কথাটা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু, গভীর ভাবে লক্ষ্য কর্লে দেখা যায় যে, সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনে নানা জটিলতারও সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিনিয়তই। বর্তমান সভ্যতা—বৈদেশিক সভ্যতা। বিজ্ঞান মানুষের বহির্জীবনের অস্বাচ্ছন্দ্য অনেকাংশে লাঘব করেছে, কিন্তু তার জন্য যে সব উপাদান সে সৃষ্টি করেছে, তা একদিক দিয়ে বহির্জীবনের অভাবমোচন করলেও অপরদিক দিয়ে নূতনতর অশান্তির সৃষ্টি করে মানুষের জীবনটাকেই করে তুলেছে জটিলতর। তবু এ সভ্যতাকে আমরা ত্যাগও কর্তে পারি না। কারণ সে'ও এসেছে একটা নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্য দিয়ে। পূর্বতন সভ্যতার সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে বিচার করে আমরা আমাদের উন্নতি অবনতির হিসাব নির্ণয় করে থাকি। যখন দেখি, একের মধ্য দিয়ে অপরটি এসেছে, স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়ে অশান্তি এসেছে; তখন বুদ্ধিমানের মত দুটোকেই স্বীকার করে নিই, দুটোকেই গ্রহণ করি। পরিণতির সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাক আর নাই থাক, দুটোকেই মেনে নিই বিনা দ্বিধায়। ফলে আর যাই হোক না কেন, সাধারণ জীবনধারণের পক্ষে কোন অসুবিধা বোধ করি না। কিন্তু যারা তা পারে না, যারা অন্তর্জীবন আর বহির্জীবনের এই অসঙ্গতিটুকু কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারে না—তাদের জীবনটাই হয়ে ওঠে শোচনীয়। আলোচ্য উপন্যাসের

নায়ক অনলের জীবনেও ছিল এই অসঙ্গতি। যে সভ্যতার ধারা বহন করে আস্‌ছি আমরা, অনলকুমার সেই সভ্যতারই ক্রোড়ে লালিত মানুষ। তবু, সেই সভ্যতার সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ ছিল না। ফলে তার জীবনের সর্বত্রই দেখা দিয়েছিল একটা গভীর অসামঞ্জস্য। তার অন্তরে জেগেছিল একটা বিক্ষোভ।

বর্তমান সভ্যতা সবচেয়ে বেশী জটিলতা সৃষ্টি করেছে নরনারীর সহজ-সম্পর্কের মধ্যে। তাই অনলের জীবনের অসামঞ্জস্য রূপ নিয়েছিল তার বিকৃত যৌন জীবনের মধ্যে। বর্তমান সভ্যতায় সে দেখেছিল, নিজের মত পরিবেশ সৃষ্টি করে বাঁচার কোনও পথই খোলা নেই। জন্মগ্রহণের আগে থেকেই মানুষের জন্য নির্দিষ্ট হ'য়ে আছে—তার পরিবেশ। সেই পরিবেশের সঙ্গে যারা সামঞ্জস্য রাখতে পারে তারা বেঁচে যায়; আর যারা তা পারে না, বিড়ম্বিত জীবনের দুর্বহ বোঝা আর ব্যর্থতার বিরাট বেদনা বহন করেই তাদের বিদায় নিতে হয়। অবশ্য সকলেরই যে একই পরিণতি হয় তাও নয়। আবেগ যাদের যত বেশী, জীবনের অসঙ্গতি তাদের তত বেশী আঘাত করে। এই অসঙ্গতি সহ্য করে বেঁচে থাকাও তত বেশী কঠিন হ'য়ে পড়ে তাদের পক্ষে।—

উপন্যাসের মধ্যে আধুনিক সভ্যতার প্রতি কটাক্ষপাত করিনি কোথাও। কারণ, আমিও এই সভ্যতার আওতায় মানুষ। তবু শিক্ষা এবং সংস্কারের মধ্য দিয়ে যে সভ্যতাকে পেয়েছি তাকে সাধ্যানুসারে বিচার এবং বিশ্লেষণ করে দেখেছি। সর্বত্রই যে এই সভ্যতার নীতিতে আমার সমর্থন আছে তাও নয়—স্থান বিশেষে প্রতিবাদও জেগেছে। কিন্তু তা প্রকাশ কর্তে পরিনি। এর মূলেও আছে এই সভ্যতার শিক্ষা। শুধু আমি একা নই—আমার মত আরও বহু মানুষের মনে এমনিতর নীরব প্রতিবাদ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে—। তাই আমাদের মনের অসহায় ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি যার মধ্যে দেখেছি—সেই অনলের শোচনীয় মৃত্যু আমার মনে

যে বেদনা জাগিয়েছে, আমি সেই বেদনাকে রূপদানের চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য।

মানুষের স্বরূপটা সাধারতঃ আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, যেটা চোখে পড়ে তা রূপ নয় রূপান্তর। রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বিকৃতিটাই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। অনলের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সাধারণ মানুষে তাঁর চরিত্রের বিকৃতিটাই দেখেছিল। ফলে, সান্ত্বনা বা সহানুভূতি কোনটাই সে পায়নি সাধারণের কাছে। কিন্তু বিকৃতিটাইত মানুষের পরিচয় নয়। বিকৃতিটা একটা অবস্থা বিশেষ। যে ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে মানুষটি এই অবস্থায় এসে পৌছাল, সেই ঘটনাপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার কর্তে গেলে, তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে বলেই আমার বিশ্বাস। অবশ্য মনঃস্তত্বের সূত্রানুযায়ী বিচার কর্লে অনলের জীবনের অনিবার্য পরিণতির একটা কারণ দেখান চলে—অনেকে চেষ্টাও করেছেন দেখাবার। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের মীমাংসা তর্কের ক্ষেত্রে মেনে নিলেও জীবনের রাজপথে দাঁড়িয়ে তাদের সেই মীমাংসা নিঃসংশয়ে মেনে নিতে পারিনি। আর পারিনি বলেই আজ অনলের জীবনের শোচনীয় পরিণতিটাকে সহজ মনে স্বীকার করে নিতেও পার্চ্ছি না।

যে সভ্যতার মধ্যে সে জন্মেছিল, তার মূলগত অসঙ্গতির বিরুদ্ধে তার মনে জেগেছিল বিদ্রোহ। অতি অল্পবয়সেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ছাত্রাবস্থায় তাঁর জীবনের যে দুটো ঘটনার কথা উল্লেখ করেছি, তার মধ্যে যদিও তার বিকৃত যৌনজীবনের কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, তবু তার মধ্য দিয়ে অনলের চরিত্রের যে দিকটা চোখে পড়ে তা হ'ল তার "অ-সাধারণত্ব"। পরিণত বয়সে, সে অসঙ্কোচে সামাজিক বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করেছিল। তার প্রচণ্ড ঔদ্ধত্য এবং অহঙ্কার প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার কাছে তাকে মাথা নীচু কর্তে দেয়নি, কোন প্রতিবন্ধকতাই তার স্বাধীনতা হরণ কর্তে পারেনি। এই অসঙ্কুচিত

আচরণ, এই প্রচণ্ড ঔদ্ধত্য, এই অনমনীয় অহঙ্কারের সূচনা দেখা গিয়েছিল তার বালকবয়স থেকে। বয়স এবং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান সভ্যতার মৌলিক অসঙ্গতির বিরুদ্ধে তার অন্তর বলিষ্ঠ প্রতিবাদে সক্রিয় হ'য়ে উঠেছিল। তাই বালকবয়সের অসাধারণত্ব পরিণত হ'য়েছিল যৌবনের উৎকেন্দ্রিকতায়। তার আক্ষিপ্ত চিত্তের নির্ভীক অভিযানের মূলেও ছিল তার অশান্ত হৃদয়ের আবেগ।

অনলের কার্যকলাপ ভাল কি মন্দ সে প্রশ্ন মীমাংসা আমার কর্ত্তব্য নয়। সে মীমাংসার ভার থাক পাঠক এবং সমালোচকদের হাতে। তার সব কিছুই যে অরুণের অতিরিক্ত সমর্থন লাভ করেছিল তাও নয়। তবে তার দুঃসাহস, অরুণ এবং অরুণের মত আরও বহু মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। কারণ, ভালমন্দের উর্দ্ধে উঠে তার দুঃসাহসকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারা যায় না। সংসারে সব কিছুর মূল্য শুধু ভালমন্দর বিচারেই নির্ণীত হয় না। যে জীবনটাকে মানুষ সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসে এবং যে মৃত্যুকে মানুষ তার চেয়েও বেশী ভয় করে, সেই জীবনের প্রতি উপেক্ষা এবং মৃত্যুর প্রতি গভীর ভালবাসাই অনলকে অন্যের কাছে দুর্জ্জেয় করে তুলেছিল। তাই যারা তাকে ঘৃণা কর্ত, তারাও তার আবেগের প্রচণ্ডতা এবং দুর্জয় দুঃসাহসকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারেনি। তার কার্যকলাপ অধিকাংশ সময়েই রুচি-নীতির শাসন লঙ্ঘন করেছে। এর জন্য অপরাধ যা হ'য়েছিল তার শাস্তিও সে পেয়েছে এবং ভুল যা করেছিল, নিজের জীবন দিয়েই তার প্রায়শ্চিত্ত করে গেছে। জীবনদেবতা যেমন তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন নি, তেমনি তার কাহিনী লিপিবদ্ধ কর্ত্তে গিয়ে, আমিও কোন পক্ষপাতিত্ব করিনি। বয়সের অনুপাতে তার কথাবার্তাগুলো শ্রুতিকটু, কিন্তু তার জন্য তার চরিত্রটাকে অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই; যেমন অবিশ্বাস করার কারণ নেই তার মদ খাওয়াটাকে। বড়লোকের ছেলে

হাতে পয়সা এবং সুযোগ পেলে এমন অনেক কিছুই করে থাকে, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মানুষের পক্ষে জীবনের সত্য আহরণ নিতান্তই সহজ।—অনলের দুটোই ছিল।

শিখারাণীর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে চাই না। কারণ তার চরিত্রের মধ্যে জটিলতা অনলের কাছেও যেমন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছিল, অরুণের কাছেও তা কিছুমাত্র স্পষ্ট হয়নি। অনলকে তার জীবনের অনিবার্য পরিণতির হাত থেকে রক্ষা করার শক্তি যার সবচেয়ে বেশী ছিল সে শিখা। কিন্তু কিছুই সে করেনি। এরজন্য তাকেও হয়ত অনেকে অভিযুক্ত কর্বেন, অনেকে অনেক মন্তব্য কর্বেন তার সম্বন্ধে। কিন্তু অনলের মত অরুণও নীরব হয়ে গেল শেষপর্যন্ত। শিখার প্রতি অনল অবিচার করেনি। শিখা সাধারণ মেয়ে—সে নিজেও নিজেকে অসাধারণ বলে প্রচার করার কিছুমাত্র চেষ্টা করেনি। এক্ষেত্রে যদি বুঝবার ভুল কিছু ঘটে থাকে, সে শিখার নয়, অনলের। অনলের মত শিখার প্রবল প্রাণশক্তি ছিল না। অনল যেমন সব কিছুকে অস্বীকার কর্তে উদ্যত, শিখা তেমনিই সব কিছু স্বীকার করে নেবার জন্য ব্যগ্র। অনলের কাছে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনই সবচেয়ে বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু শিখা যে সমাজে জন্মেছে, যে সমাজে সে বাস করে, সে যে সেই সমাজেরই একটা অংশ, এ কথা সে নিজেও ভোলেনি, অনলকেও ভুলতে দেয়নি। অনলকে সে কোন প্রতিশ্রুতিই দেয়নি, আবার প্রবঞ্চনাও করেনি। শিখার মধ্যেও ছিল একই অসঙ্গতি যা অনলকে করেছিল আক্ষিপ্ত। কিন্তু শিখা আপন অন্তরের প্রাসাদে সেই অসঙ্গতিকে প্রশ্রয় না দিয়ে কর্তব্যের অনুশাসনের কাছে নিজের ব্যক্তিসত্তা নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু মানবসত্তার ব্যাকুলতা সে সম্পূর্ণ সংযতও কর্তে পারেনি। সেখানে ছিল অনলের জন্য তার নারী হৃদয়ের গভীর উৎকণ্ঠা।

শেষ সাক্ষাতের মুহূর্তে শিখার মনে নারীত্বের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধেছে তার সাংসারিক কর্তব্যবোধের। আদর্শের সঙ্গে আদর্শের সংঘাত, তাই অনলকে সে ফিরিয়ে দিয়েও মনে মনে আত্মসমর্পণ কর্তে দ্বিধা করেনি। এবং কথাটা সে অনলকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই জানিয়েছিল। কিন্তু ভয়ও ছিল মনে, হয়ত অদূর ভবিষ্যতে অনল তার প্রাপ্য দাবী কর্তে পারে। যদি অনল তা কর্ত, তা'হলে তাদের কি পরিণতি হ'ত? এই চিন্তাই শিখাকে বিচলিত করেছিল। কারণ কর্তব্যবোধের হাত থেকেও সে নিষ্কৃতি পায়নি। অদূর ভবিষ্যতে পেত কিনা তারও কোন নিশ্চয়তা ছিল না। তাই অনলকে সে নিষেধ করেছিল আর যাতে সে তার কাছে না আসে। এরপর যা ঘটল, তা কেন ঘটল, এবং তার জন্য কার দোষ বেশী; কে ভুল কর্ল এবং সে ভুলের জন্য দায়ী কে—এসব প্রশ্নের কোন জবাবই আমি দিতে পার্ব না। কারণ সেটা আমার কাজও নয়।

এবারে একটু সাধারণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমার এই দীর্ঘ ভূমিকার ছেদ টানব। যদিও কাজটি খুব সহজ নয়। কারণ, আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্যই আমি অনেকের কাছেই অনেক ঋণী। কিন্তু ঋণী হয়েও আমার দুঃখ এই যে, তাঁদের অনেকেই আমায় এই সুলভ সুযোগের সদ্ব্যবহার করবার অনুমতি না দিয়ে বঞ্চিত করেছেন। তবু বলব একজনের নাম। তিনি শ্রীযতীন্দ্র নাথ চৌধুরী। তাঁর কাছে, আমার ঋণের স্বরূপটা কিন্তু বলতে পার্ব না। কারণ তিনি হয়ত রুষ্ট হবেন, আর আমি বঞ্চিত হব তার ভবিষ্যৎ সাহায্য থেকে।

আর, যাঁদের আশীর্বাদ আমার সাহিত্যসাধনার পথে অক্ষয় সম্পদ বলে মনে করি তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হ'লেন আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার মত ধৃষ্টতা আমার নেই।—

শ্রীআদিত্য শঙ্কর

জগতে এক ধরণের মানুষ আসে, যাহারা সারা জীবন উল্লেখযোগ্য কিছুই করেনা। অক্ষম বলিয়া নহে; এই মানুষগুলা প্রয়োজনের অতিরিক্ত বুদ্ধি শক্তি সব লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সমস্ত জীবন ধরিয়া সে সমস্ত লইয়া এমন অবলীলাক্রমে ছেলেমানুষী করিয়া যায় যে আত্মীয় স্বজন হইতে বন্ধু-বান্ধব সকলেই এক বাক্যে তাহাদের 'অপদার্থ' বলিয়া অভিহিত করিতে কিছুমাত্র ইতঃস্ততঃ করেন না। যাঁহারা তাহাদের কিছুটা স্নেহ করেন, তাঁহারা তাহাদের অপরিণত মতিবুদ্ধি এবং অস্থিরচিত্ততার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া 'ছেলেটা কিস্‌সু কর্ল না' বলিয়া স্নেহ মিশ্রিত খেদ ধ্বনি করেন। আর যাহারা তাহাদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করেন তাঁহারা তাহাদের উদ্দেশ্যবিহীন কার্যকলাপ দেখিয়া, গম্ভীর ভাবে অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করেন, 'এত জানা কথাই, ওর কিইবা করার আছে—এ ছাড়া আর কর্বেই বা কি?' বলা বাহুল্য শেষোক্ত মন্তব্য করার মত লোকের সংখ্যাই বেশী। যে মানুষগুলার কথা বলিতে বসিয়াছি তাহারা সংসারে কাহারও কোন মন্তব্যেরই প্রত্যুত্তর দেয় না; দেখিলে মনে হয় যেন এ সমস্ত তুচ্ছ কথা লইয়া আলোচনা করার মত সময়ই তাহাদের নাই। তাহাদের সম্বন্ধে এক এক দল লোক এক এক প্রকার মনোভাব পোষণ করে; কিন্তু মুস্কিল হয় তাহাদের যাহারা সাধারণের প্রচলিত বিধিনিষেধের বহির্ভূত এই সৃষ্টিছাড়া মতি বুদ্ধির মানুষগুলাকে ভালবাসে। কারণ এই সৃষ্টিছাড়া মানুষ গুলা সকলের সব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তিরস্কার-অভিযোগের নাগালের বাইরেই থাকিয়া যায়। কিন্তু তাহাদের আত্মীয়-স্বজন শতসহস্র কথার দ্বারা এই কথাটাই প্রকারান্তরে জানাইয়া দেন যে, তাহাদের যাহারা ভালবাসে অন্যায়টা সম্পূর্ণ তাহাদেরই!

এই সমস্ত কথার প্রতিবাদ করারও কোন উপায় থাকে না। কারণ যে মানুষগুলার পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিব সে মানুষগুলির সব কাজ বা সব কথা সব সময় আমরা নিজেরাই বুঝিতে পারি না; এবং তাহাদের সে সমস্ত কাজ করিবার বা সে সব কথা বলিবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণও খুঁজিয়া পাই না। দ্বিতীয়তঃ যে মানুষগুলাকে লইয়া এত বাদ বিসংবাদ সেই মানুষগুলি যেমন সকলের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা তিরস্কারের প্রত্যুত্তরে সস্মিত মুখে চাহিয়া থাকে, কোন কথা বলে না, ঠিক তেমনি যাহারা তাহাদের ভালবাসে, তাহাদের স্নেহান্ধ অন্তরের সব উপদেশ নিবিষ্টমনে শুনিয়া হাসিমুখেই উঠিয়া চলিয়া যায়, কোন জবাব দেয় না। ইহাদের কাছে সংসারের কোন কিছুরই যেন কোন মূল্য নাই, অর্থ নাই। সব কিছুই যেন তাহাদের কাছে হাসির ব্যাপার। যাঁহারা তাহাদের অবজ্ঞা করেন, তিরস্কার করেন, তাঁহাদের ক্রোধের মাত্রা যেমন দিন দিন বৃদ্ধি পায়, যাহারা তাহাদের ভালবাসে তাহারাও তেমন উত্তরোত্তর অসহিষ্ণু হইয়া উঠে। এরা, এই সৃষ্টিছাড়া মানুষগুলি গভীর ঔদাসীন্যের দ্বারা উভয় পক্ষকেই পরাস্ত করিয়া স্বনির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া আপনার খেয়ালী মনের শত সহস্র খেয়াল চরিতার্থ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত একদিন নিজের জীবনটাকেই ব্যর্থতার মধ্যে পর্য্যবসিত করিয়া দেয়। সেদিন, যাঁহারা তাহাদের অবজ্ঞা করিত, তাঁহারা ওষ্ঠ বিকৃত করিয়া বলেন, 'এত জানা কথাই' অথবা বিদ্রূপাত্মক হাসি হাসিয়া বলেন, 'বাঁচা গেল।' কিন্তু যাহারা তাহাদের ভালবাসে চোখের জলটা তাহাদেরই বেশী পড়ে। সর্ব্ববাদিসম্মত অপদার্থের খেয়ালী জীবনের অনিবার্য্য পরিণাম স্মরণ করিয়া তাহারাই বেশী কাঁদে।

সরকারী চাকুরী হইতে সসম্মানে অবসর গ্রহণ করিয়া পেন্সন পাইয়া স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া নিরুপদ্রব জীবন যাপনের মধ্যে এমনি একটি মানুষের কথা অসতর্ক মুহূর্ত্তে মনে পড়িলে শুষ্ক চোখে আজও জল আসিয়া

পড়ে। —তাহার নাম অনলকুমার। পদবী মুখোপাধ্যায়। বাপ ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক। ধীর স্থির শান্ত স্বভাবের মানুষটি, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ প্রচুর। চেহারার মধ্যে আভিজাত্যের কোন আস্ফালন নাই। ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক শান্ত মুখশ্রী, প্রশস্ত ললাট, বুদ্ধিদীপ্ত দুইচোখ; সে মুখের পানে চাহিলে শ্রদ্ধায় মাথা আপনি নত হইয়া যায়। তাঁহারই একমাত্র সন্তান অনলকুমার। পিতার অবিকল প্রতিমূর্ত্তি—তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত চোখের চাহনি, তেমনি প্রশস্ত ললাট, ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক মুখচ্ছবি; পার্থক্য শুধু তাহার আচার ব্যবহারে—অপরিসীম চঞ্চল এবং অস্থিরচিত্ত। গায়ের রঙ অস্বাভাবিক ফর্সা। সৃষ্টিকর্ত্তার অর্থহীন খেয়ালের অপূর্ব নিদর্শন এই অনলকুমার। স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে তাহার চেহারা এবং চাঞ্চল্য একটা সাড়া জাগাইয়া তুলিত। শুধু ছাত্রেরাই নহে, শিক্ষকেরাও বিস্মিত দৃষ্টিতে এই প্রাণবন্ত অস্থিরচিত্ত সুশ্রী ছেলেটিকে লক্ষ্য করিতেন। লক্ষ্য করিবার যথেষ্ট কারণও ছিল। সে ছিল ক্লাসের অখ্যাত ছেলেদের মধ্যমণি। স্কুলে ভর্তি হইবার পরদিন হইতে স্বেচ্ছায় সে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছিল ক্লাসের সর্বশেষ বেঞ্চিটিতে। শিক্ষকেরা ক্লাসে পড়াইবার সময় নির্নিমেষ নয়নে তাঁহাদের পানে চাহিয়া থাকিত এবং মাঝে মাঝে খাতায় কি যেন লিখিয়া লইত। কিন্তু বৎসরান্তে পরীক্ষায় পাশমার্ক হইতে সামান্য দুই চারি নম্বরের অধিক নম্বর পাইতে কেহ কখনও দেখে নাই। শিক্ষক ছাত্র সকলের কাছেই ছিল সে পরম বিস্ময়ের পাত্র। এমন মনোযোগের সহিত পড়াশোনা করিয়া এমন কৃতিত্বের সহিত কম নম্বর পাওয়াটা অভিজ্ঞ শিক্ষকদেরও ধারণার অতীত ছিল। ধরা পড়িয়া গেল হঠাৎ একদিন। তখন আমরা ক্লাস সিক্স অর্থাৎ ফিফ্‌ত ক্লাসের ছাত্র। পরপর দুইটা বছর কোন রকমে পাশ করিয়া অনল আমাদের সঙ্গে এক সঙ্গে

ক্লাসে উঠিয়াছে। সহপাঠী হিসাবে সামান্য আলাপ ছিল তাহার সঙ্গে। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করি নাই কখনও। আমার দিক হইতে বাধাও ছিল অনেক। প্রথমতঃ আমি ক্লাসের ভাল ছেলেদের মধ্যে একজন। দ্বিতীয়তঃ অনলের চালচলনের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিবার মত শক্তিও আমার ছিল না। সঙ্গতিপন্ন পিতার একমাত্র সন্তান সে—টিফিনের সময় বাড়ী হইতে তাহার খাবার আসিত। উপরন্তু সে খাবার খাইয়াও নগদ দুই আনা পয়সা খরচ করিয়া আলুকাবলি, ঘুগনি প্রভৃতি মুখরোচক খাবার খাইয়া টিফিনের আধঘন্টা সময় গুলি খেলিয়া ঘণ্টা পড়িলে আমড়াটি প্যাণ্টের পকেটে লইয়া ভাল মানুষের মত ক্লাসে আসিয়া বসিত। ক্লাসে শিক্ষকের দৃষ্টি এড়াইয়া গোপনে ঝালনুন সহযোগে অর্দ্ধভুক্ত আমড়াটি শেষ করিয়া শান্তশিষ্টের মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া জল খাইতে যাইবার অনুমতি চাহিত। অন্যান্য ছেলেদের মত আমিও মাঝে মাঝে বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখিয়াছি মাত্র। অবশ্য সময়ে সময়ে সে আমার পাশে আসিয়াও বসিয়াছে। কিন্তু সে শুধু অঙ্কের ক্লাসে। কারণ অঙ্কটা একাকী করিবার মত চেষ্টা তাহার কোনদিনই দেখি নাই। তবে সাধারণতঃ সে একাই থাকিত। ভাল ছেলে হইলেও আমি বসিতাম তৃতীয় বেঞ্চিতে। কারণ স্বভাবতঃই আমি ছিলাম একটু লাজুক প্রকৃতির। একদিন ইতিহাসের ঘণ্টায় নিবিষ্টচিত্তে মুসলমান সম্রাট মহম্মদ তুগলকের চিত্তাকর্ষক পাগলামির ইতিহাস ব্যক্ত করিতে করিতে সহসা ইতিহাসের বিষয়বস্তুর বক্তৃতার সূত্র ছিন্ন হইল মাষ্টার মহাশয়ের আহ্বানে, 'অনল ইদিকে আয়'। ইতিহাসের মাষ্টার রমেনবাবু এমনি লোকটি ভালই। পরিষ্কার চেহারা, সৌখীন মানুষটি। মাথার সামনের দিকটায় একটু টাক পড়িয়া কপালটা বেশী চওড়া দেখায়—সেটুকু গোপন করিবার জন্য বরাবর চুলগুলি পিছনের

দিকেই আঁচড়াইয়া থাকেন। চেহারার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাঁহার নিলবর্ণের চোখ দুইটি। আর চেহারা বাদ দিয়া উল্লেখযোগ্য তাঁহার কণ্ঠস্বর। কিঞ্চিৎ নারীসুলভ কোমলতা ছিল। কিন্তু মেজাজটি ছিল তাঁর অল্প বিস্তর উগ্র এবং শাস্তি বিধানের মধ্যেও অভিনবত্ব ছিল যথেষ্ট। অপরাধী হাতের সীমানার ভিতরে আসা মাত্রই চকিতে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া পেটের কোমল অংশটিকে দুইটি আঙ্গুলের সাহায্যে অদ্ভুত কৌশলে ধরিয়া ফেলিতেন—তাহার পর ছোট ছোট চুলের যে অংশ কাণের সামনে অপ্রয়োজনীয় হিসাবে থাকে, দুইটি আঙ্গুলের সাহায্যে সেগুলিকে ধীরে ধীরে উপরে তুলিতে সুরু করিতেন। ফলে অপরাধী মুখ বিকৃত করিয়া প্রথমে পায়ের পাতায় ভর দিয়া দাঁড়াইত, তারপর ধীরে ধীরে কাঠের যে বস্তুটির উপর শিক্ষক মহাশয়ের চেয়ারটি বসান থাকে তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইত, এবং আরও কিছুটা উঠিবার চেষ্টা করিবার পূর্বেই চপেটাঘাতে আবার পূর্বস্থানে অর্থাৎ মেঝেয় নামিয়া দাঁড়াইত। তাঁহাকে বেত ব্যবহার করিতে কেহ কখনও দেখে নাই। কিন্তু শাস্তি হিসাবে তাহার হস্তকৌশল বেতের অপেক্ষাও মারাত্মক বলিয়া মনে হইত। কাহাকেও আহ্বান করিবার সময় যত ধীরস্বরে ডাকিতেন তাহার শাস্তির পরিমাণও ততই বেশী হইত। তাই আহ্বানের তারতম্য বিচার করিয়া অপরাধী শাস্তি সম্বন্ধে অবহিত হইবার সময় পাইত কিছুটা। সেদিন অনলকে আহ্বান করিবার সময় তাঁহার ধীর কণ্ঠস্বরে ক্লাসশুদ্ধ সব ছেলের দৃষ্টি একযোগে গিয়া পড়িল অনলের উপর। অনল একাগ্রচিত্তে তাহার খাতায় কি যেন লিখিতেছিল। রমেন বাবুর আহ্বানে চকিতে খাতাটিকে লুকাইবার ব্যর্থ চেষ্টা আমাদের কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না। রমেন বাবু আবার ডাকিলেন, 'অনল ইদিকে উঠে আয়।' ধরা পড়িয়া যাওয়ার লজ্জায় অনল ম্লান মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। রমেন বাবু বলিলেন,

'খাতাটা নিয়ে আয়।' অনলকে ইতঃস্তত: করিতে দেখিয়া রমেন বাবু তাহার পাশের ছেলেটিকে বলিলেন, 'খাতাটা কেড়ে নেত নলে।' ন'লে অর্থাৎ নলিনী রমেন বাবুর হুকুম তামিল করিবার জন্য হাত বাড়াইতেই অনল তর্জ্জন করিয়া উঠিল, 'খবর্দ্দার শালা, মেরে ফেলে দেব তোকে।' নলিনী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া নাকিসুরে বলিয়া উঠিল, 'অনল আমায় শালা বল্ল স্যর।' রমেন বাবু হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, 'অনল'। দ্বিরুক্তি না করিয়া অনল খাতাখানা লইয়া উঠিয়া গিয়া রমেন বাবুর কাছে দাঁড়াইতেই রমেন বাবু চিরাচরিত প্রথামত সহসা অনলের তলপেটের একটা অংশ দুই আঙ্গুলের সাহায্যে চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, 'কি কর্চ্ছিলি বসে বসে?'

অনল উত্তর দিল 'কিছু না স্যার।'

—'কিছু নাত' খাতায় কি লিখছিলি?'

অম্লান বদনে অনল উত্তর দিল, 'বানান লিখছিলাম।'

ক্রুদ্ধস্বরে বারকয়েক অনলকে ঝাঁকানি দিয়া রমেন বাবু বলিলেন, 'বানান লিখছিলি? কিসের বানান?'

তেমনি ধীরকণ্ঠে অনল উত্তর দিল, 'ইতিহাসের বানান স্যার।'

—'ইতিহাসের বানান স্যর,' কথাটার পুনরুক্তি করিয়া রমেন বাবু বলিলেন, 'কই বার কর কোথায় বানান লিখছিলি? বার কর খাতা?'

অনল হাতের খাতাটার পাতা উল্টাইতে লাগিল। পেটের অংশটুকু তখনও রমেনবাবুর হস্তগত হইয়া রহিয়াছে। খাতাটার আকৃতি দেখিয়া রমেনবাবু বিকৃত মুখে বলিলেন, 'এঃ খাতা করেছে দেখনা, যেন কাশীদাসের মহাভারত রচনা কর্তে বসেছে।'

পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে অনল একখানা পাতা খুলিয়া ধরিল রমেনবাবুর সামনে। সত্যই তাহাতে গোটা কতক শব্দ লেখা রহিয়াছে। ঐতিহাসিক নামগুলি সযত্নে লিখিয়া রাখিয়াছে সে।

রমেনবাবু কোন অপরাধ সপ্রমাণ করিতে না পারিয়া বলিলেন, 'বানান লিখতে তোকে কে বলেছে ? এটা কি বানান লেখার ক্লাস ?'

অনল নিরুত্তর। পেটের অংশটুকু ছাড়িয়া দিয়া সহসা রমেনবাবু অনলের জুলফিগুলা আকর্ষণ করিয়া উর্দ্ধে উঠইতে লাগিলেন। বলিলেন, 'নলিনীকে শালা বল্লি কেন বল ?'

অনল রমেনবাবুর এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনেই হইল না' যে তাহার জুলফিগুলা রমেনবাবু হাতের মুঠায় আছে। অথবা সেগুলি লইয়া যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য সে কোন বেদনা অনুভব করিতেছে, একথাটা আমরা কেহই তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না। স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী ছেলেরা যেমন জুলফির আকর্ষণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রথমে পায়ের পাতার উপরে, তাঁরপর প্লাটফর্মের উপর উঠিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে চড়ের আঘাতে মাটিতে ফিরিয়া আসিত, অনল সে সব কিছুই না করিয়া প্রস্তরবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। রমেনবাবুও বোধকরি স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখিয়া সহসা জুলফিটা ছাড়িয়া দিয়া সম্পূর্ণ নূতন প্রশ্ন করিয়া বসিলেন। বলিলেন, 'তোর বাবা এতবড় একজন প্রফেসর, আর তাঁর ছেলে তুই; বড় হয়ে কি কর্বি ?'

এতক্ষণ পরে বোধকরি মনের মত প্রশ্ন শুনিয়া অনল ধীরকণ্ঠে উত্তর দিল, 'ঘোড়ার ঘাস কাটব স্যর।'

প্রশ্নটা অনলের মনোমত হইয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু তাহার উত্তরটা যে রমেনবাবুর কিছুমাত্র ভাল লাগে নাই, তাহা পরক্ষণেই বুঝিতে পারিলাম। কারণ উত্তর শুনিয়াই রমেন বাবু 'কি বল্লি', বলিয়া মুহুর্মুহু চড় এবং কিল বর্ষণ করিয়া অনলের শীর্ণ দেহটাকে একেবারে মাটিতে লুটাইয়া দিলেন। অনল উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। আরও বেশ কিছুক্ষণ হস্ত চালনার পর,'দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে হতভাগা পাজী গাধা কোথাকার',

বলিয়া অনলের চুলের মুঠি ধরিয়া সজোরে তাহাকে ঠেলিয়া দিলেন। অনল দেওয়ালের সহিত ধাক্কা খাইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ধীরে ধীরে স্বস্থানে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই রমেনবাবু অবার হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, 'না ওখানে বসতে হবে না। বস থার্ড বেঞ্চিতে।'

অনল কোন কথা না বলিয়া সশব্দে থার্ড বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িল, আমারই পাশে। অনলের কথায় আমরা সকলেই হাসিয়া ফেলিয়াছিলাম। কিন্তু রমেনবাবুর নির্দ্দয় প্রহার স্বচক্ষে দেখিবার পর কেন জানি না মনে হইতে লাগিল অত মারাটা রমেন বাবুর ঠিক হয় নাই। ক্লাসশুদ্ধ সমস্ত ছেলেই প্রহারের গুরুত্ব দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। নীরবতা ভঙ্গ করিয়া রমেনবাবু আবার ইতিহাস সুরু করিলেন, 'তারপর যখন দাক্ষিণাত্যে মারাঠারা বিদ্রোহ কর্ল—'

পাশে বসিয়া অনল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। আমার মন তখন দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহীদের কথা ভুলিয়া অনলের কথাই চিন্তা করিতেছে। ভাবিলাম না জানি কত আঘাতই লাগিয়াছে। এই ঘটনায় রমেনবাবুর উপর এক মুহূর্ত্তেই মনটা বিরূপ হইয়া গেল। সহসা একটা খোঁচা খাইয়া চমকাইয়া উঠিলাম। খোঁচাটা দিয়াছে অনল। ফিরিয়া দেখি দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া হাসিতেছে—তাহার পানে চাহিতেই নিম্নস্বরে সে বলিল, 'শালা এখনও আমার দিকে দেখছে নাকি?'

অর্থাৎ রমেনবাবু তখনও তাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন কিনা তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছে।

বলিলাম, 'না।'

ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল, 'শালা কি মারটাই মার্ল মাইরী, উফ্।'

তাহার কথার ধরনে অত্যন্ত হাসি পাইল। কিন্তু পাছে হাসিলে রমেনবাবুর চোখে পড়িয়া যাই এই ভয়ে চুপ করিয়া রহিলাম। অনল বলিল, 'আমার কিন্তু ভীষণ হাসি পাচ্ছে মাইরী।'

প্রচণ্ড বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেলাম। অমন নির্ম্মম প্রহারের মধ্যে হাসির কি কারণ ঘটিয়া থাকিতে পারে তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। কিন্তু প্রশ্ন করিতে সাহস হইল না। কারণ জানিতাম অনল মাঝে মাঝে এমন এক একটা রসিকতা করে যাহার জের সামলান অত্যন্ত কঠিন। ইতিহাসের ঘণ্টার শেষে রমেনবাবু ক্লাস হইতে বাহির হইয়া যাইতেই অনল ছুটিয়া গিয়া টেবিলের উপর হইতে নিজের খাতাখানা লইয়া আসিল। এতক্ষণ পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'খাতা নিয়ে কি কর্ছিলি বল ত?'

একগাল হাসিয়া বলিল, 'দেখবি?'

বলিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া খাতার একটা পাতা খুলিয়া আমার সামনে ধরিল। দেখি একটা ছবি আঁকিয়াছে। তাহার মুখের চেহারা অবিকল রমেনবাবুর মত। শরীরের অন্যান্য স্থান সম্বন্ধে এমন অদ্ভুত অভিনবত্বের পরিচয় দিয়াছে যে, না হাসিয়া পারা যায় না। বলা বাহুল্য ছবিটা মোটামুটি অশ্লীল রসাত্মক। ছেলে বেলায় অশ্লীল রসাত্মক সব কিছুই ছিল যেন হাসির ব্যাপার। আমায় হাসিতে দেখিয়া ক্লাসের আরও দুই চারিজন ছেলে উঁকি মারিয়া ছবিটা দেখিয়া লইল। কিন্তু নলিনী ছবিটা দেখিবার জন্য মুখ বাড়াইতেই অনল বলিল, 'ভাগ শালা, তোকে দেখাব না।'

বলিয়া পরক্ষণেই নলিনীর মত নাকিস্বরে ব্যঙ্গ করিল, 'সঁ্যর অঁনল আঁমাকে শাঁলা বঁল্ল সঁ্যর।'

তাহার কথার ধরনে ক্লাসের আরও অনেক ছেলেই হাসিয়া উঠিল। নলিনী লজ্জিত মুখে বসিয়া পড়িল।

অনলের সহিত আমার পরিচয় কি করিয়া হইয়াছিল সে কথা আমার মনে নাই। থাকিবার কথাও নহে। তবে ঘনিষ্ঠতা কি ভাবে হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু মনে আছে। উপরোক্ত ঘটনার

পর হইতেই অনলের সম্বন্ধে কিছুটা কৌতূহলী হইয়া পড়িয়াছিলাম। মাষ্টার মহাশয়ের হাতে কখনও শাস্তি ভোগ করিবার মত কোন গুরুতর ঘটনা আমার জীবনে ঘটে নাই। পারিবারিক জীবনেও আমার সে অভিজ্ঞতা ছিলনা। শতকরা নিরানব্বই জন বাঙ্গালী ছেলের মত আমিও নেহাৎ শান্তশিষ্ট ছিলাম। স্কুল বসিবার আধঘণ্টা আগে স্কুলে যাইতাম, টিফিনের সময় গুলি খেলিবার মত উৎসাহ কোন দিনই জাগে নাই; ছুটির শেষে বই বগলে করিয়া নিঃশব্দেই বাড়ী ফিরিয়াছি এবং সন্ধ্যা ছয়টা বাজিতে না বাজিতেই অখণ্ড মনোযোগের সহিত বই লইয়া বসিয়া একাগ্রচিত্তে আগামী দিনের পড়া তৈরী করিয়াছি। স্কুল পলাইয়া খেলা দেখিতে যাওয়া বা সিনেমায় যাওয়া অথবা ছাত্র সুলভ অন্য কোন দুঃসাহসের পরিচয় কোনদিন দিই নাই। তাই প্রতি বৎসর স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষায় সসম্মানে পাশ করিয়াছি এবং পুরস্কার বিতরণের দিনে সলজ্জ পদক্ষেপে সভাপতির হস্ত হইতে পুরস্কার গ্রহণ করিবার সময় কিছুটা গর্ব্বও অনুভব করিয়াছি। তারপর একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া চলনসই গোছের মোটা মাহিনার সরকারী চাকুরী করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তেমনি সসম্মানে অবসর গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল যে এই সুদীর্ঘ দিনগুলির মধ্যে যে মানুষটির সহিত সকলের চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতা করিয়াছি, সে মানুষটি তাহার জীবনের সুরু হইতে শেষদিন পর্যন্ত অখ্যাত অজ্ঞাত থাকিয়া অকস্মাৎ একদিন জীবনের মধ্যপথে অত্যন্ত অনাড়ম্বরের মধ্যেই বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। আমি অনলের কথাই বলিতেছি। তাহার সহিত মাঝে মাঝে নিজের জীবনটাকে তুলনা করিয়া দেখিতে গিয়া নিজের মনের মধ্যেই কেন জানি না আজও কিছুটা লজ্জা অনুভব করি। ইহাকে আমার মনের নিছক দৌর্বল্য বলিয়া উড়াইয়া দিবার যথেষ্ট যুক্তি আছে তাহা আমি

জানি। কিন্তু সঙ্গীহীন অবকাশ মুহূর্ত্তে আপন মনে যখন তাহার কথা চিন্তা করিয়াছি তখন সেই সব যুক্তিগুলি অবতারণা করাইতে পারি নাই। ছাত্রাবস্থায় নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্যান্য পাঁচজন ছেলের মত অনেক অসম্ভব কল্পনা দ্বারা অনেক উজ্জ্বল ছবি আঁকিয়াছি। সেই ছবিগুলিকে সত্যে পরিণত করিবার জন্য অনেক শক্তিও ব্যয় করিয়াছি। —কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই সব কল্পনার কয়টা সত্যে পরিণত হইয়াছে? কিন্তু যে মানুষটি তাহার শৈশবে নিজের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে শিক্ষকের সম্মুখে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অকপট স্বীকৃতি ঘোষণা করিয়া নিদারুণ লাঞ্ছনা হাসিমুখে সহ্য করিয়াছে সেই মানুষটি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নিজের শিশুচিত্তের সেই হাস্যকর উক্তিকে উচ্ছল যৌবনের দিনেও তেমনি হাসিমুখে অবহেলার সহিত সত্যে পরিণত করিয়াছে। আজ বার্দ্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইয়া এই কথাই মনে হয়—সেই জিতিয়াছে, আমরা হারিয়া গিয়াছি। ঘোড়ার ঘাস কাটা মানব জীবনের প্রশংসনীয় আদর্শ নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু প্রশংসাত সে চায় নাই কখনও। সে যাহা চাহিয়াছিল তাহা সে পাইয়াও ছিল। জীবনের গতিশীল পটভূমিকার মধ্যে অবস্থা বিপাকে পড়িয়া আমরা ইতঃস্তত: করিয়াছি, বিচলিত হইয়াছি, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পড়িয়া সময়ে সময়ে জীবনের সহিত লজ্জাজনক সন্ধি করিয়া পরাজয়ের হাত এড়াইয়াছি। কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে অবিচলিত চিত্তে নিজের জীবনের সহিত কঠোরতম পরিহাস করিয়া গিয়াছে, ভাগ্যের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া আপনার পারিপার্শ্বিকতাকে তাহার স্বভাব সুলভ ঔদ্ধত্য এবং অহঙ্কারের দ্বারা সহাস্য মুখে অস্বীকার করিয়া গিয়াছে। কোনদিন তাহাকে ইতঃস্তত: করিতে দেখি নাই—জীবনের সহিত সন্ধি করিতে দেখি নাই কখনও। তাহার প্রতি সংসারের সকলে সুবিচার করে

নাই, বরং অবিচারই করিয়াছে বেশী। আমিও সময়ে সময়ে তাহার প্রতি কঠিন অবিচার করিয়াছি; কিন্তু কোনদিন কোন প্রতিবাদ করে নাই সে। কে জানিত যে, যে ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষকের হাতে লাঞ্ছিত হইয়া, শিক্ষক ছাত্র সকলের কাছেই সে বিদ্রূপের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল, একদিন আমাকেই সেই ঘটনার জের টানিতে বসিয়া তাহার সম্বন্ধে এতগুলি কথা লিখিতে হইবে।

ঠিক যে কি কারণে তাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম মনে নাই। তাহার চেহারায় আকর্ষণীয় বস্তু ছিল কিছু; তাহার সুললিত কণ্ঠের গান ও আবৃত্তির এবং তাহার বাঁশী বাজানর প্রশংসা করে নাই, এমন মানুষ খুবই কম ছিল। স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় গান গাহিবার ভার চিরদিন তাহাকেই লইতে হইয়াছে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। সে সময়ে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি সভাস্থ লোকেরাও পুরস্কার গ্রহণের পরে করতালি ধ্বনি অপেক্ষা তাহার গানের পরেই করতালি দিয়াছে বেশী। কিন্তু ভাল তাহাকে সে জন্য বাসি নাই। মনে হয় বাল্যকালে এক একটা ছেলেকে হঠাৎ ভাল লাগিয়া যায়; কেন লাগে না লাগে তাহার যুক্তিযুক্ত কোন কারণই থাকে না। অনলকেও ভালবাসিয়াছিলাম ঠিক সেই জন্যই। রমেনবাবুর প্রশ্নের উত্তরে ঘোড়ার ঘাস কাটিবার সঙ্কল্প জানাইয়া প্রহৃত হইবার পরদিন হইতে সে নিয়মিত আমার পার্শ্বে বসিতে সুরু করিল। বোধহয় ভাগ্যের চক্রান্তে।—

বস্তুতঃ সেইদিন হইতেই তাহার প্রতি একটা হৃদ্যতা জন্মাইয়া গেল। ঘটনার পরদিন হইতেই সে অঙ্কের ক্লাশে আমার খাতার প্রতি বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া প্রত্যেকটি আঁকের সঠিক উত্তর লিখিয়া আঁকের মাষ্টার মহাশয়ের সুপরিচিত ঠাট্টার হাত নির্বিঘ্নে এড়াইতে সুরু করিল। তবে সত্য-বলিতে কি পারিশ্রমিক হিসাবে টিফিনের সময় ঝালনুন সহযোগে আমড়া অথবা আলুকাবলির একটা মোটা অংশ নিয়মিতই আমায় দিয়া

আসিয়াছে। এমনি করিয়াই বাল্যের তুচ্ছ সামগ্রীর আদানপ্রদানের মধ্যদিয়া পরস্পরের মধ্যে মনের আদান প্রদানও ঘটিয়া গিয়াছে নিতান্তই অনাড়ম্বরভাবে, সঙ্গীদের কৌতুহলী দৃষ্টির অন্তরালে। বেশ মনে আছে সেই বছরের বাৎসরিক পরীক্ষায় অভাবিত ভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করিবার জন্য শিক্ষক ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মীয় স্বজন সকলেই একযোগে আমাকে এই বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন যে, কুসঙ্গে মিশিয়াই আমি আমার অধঃপতন ঘটাইয়াছি। কারণ ইহার পূর্ব্বে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করার গৌরবটুকু বরাবর আমারই প্রাপ্য ছিল। অনলের সহিত হৃদ্যতার সংবাদ তাঁহারা পাইয়াছিলেন। শিক্ষকেরা তিরস্কার করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, কিন্তু আমার পিতার হস্ত আমার কর্ণমূল পর্য্যন্ত পৌছাইয়া আমাকে বেশ কিছু লজ্জা দিয়াছিল। কিন্তু কোন কিছুতেই কিছু হইল না। অনলের সহিত বন্ধুত্ব ছিন্ন করিতে পারিলাম না। কাঁচপোকা যেমন করিয়া আরশুলাকে আকর্ষণ করে, অনলও যেন তেমনি করিয়াই নিয়ত আমার আকর্ষণ করিত। উহা যে কিসের আকর্ষণ তাহা সেদিনও যেমন বুঝিতে পারি নাই, পরবর্ত্তী জীবনেও তাহা তেমনি দুর্বোধ্য রহিয়া গিয়াছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইটুকুই উপলব্ধি করিয়াছি যে জগতে একপ্রকার মানুষ এমন এক অদ্ভুত মোহিনী শক্তি লইয়া জন্মগ্রহন করে যে একবার যদি তাহার সংস্পর্শে কোন প্রকারে কেহ আসিয়া পড়ে তাহা হইলে তাহার আর নিস্তার নাই। সেই মানুষটির মোহিনীশক্তি অপরকে তাহার দুর্নিবার আকর্ষণে অহর্নিশিই টানিতে থাকিবে—সে আকর্ষণ হইতে আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই। সত্য কথা বলিতে কি আমি অনলকে যতটা ভালবাসিতাম সেও যে আমায় ততখানি ভালবাসিত না তাহা বাল্যকালে না বুঝিলেও পরবর্ত্তী জীবনে বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু তবুও তাহাকে আর পাঁচজনে যেমন অবজ্ঞার সহিত ত্যাগ করিয়াছিল, আমি তেমনি ভাবে তাহাকে ত্যাগ করিতে পারি নাই।

ফোর্থ ক্লাশে উঠিয়া অনল একদিন আমায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুই সংস্কৃত নিবি না পালি নিবি?

বলাবাহুল্য ফিফথ্ ক্লাস পর্যন্ত সংস্কৃতটা ছিল বাধ্যতামূলক—ফোর্থক্লাশে উঠিলে সংস্কৃতের বদলে পালি লওয়া চলিত। সহজে বেশী নম্বর পাইয়া পাশ করিবার প্রয়োজনে পালিটা সত্যই লাভজনক। কিন্তু একে ক্লাশের অন্যতম ভালছাত্র আমি; তাহার উপর পণ্ডিতমশাই আমায় প্রথম দিনেই বলিয়াছিলেন সংস্কৃত লইবার জন্য। তাই বলিলাম, 'সংস্কৃতই নেব'।

কথাটা বোধকরি অনলের মনঃপূত হইল না, বলিল, 'কেন পালি নেনা? কত সহজে পাশ করে যাবি, তাছাড়া ডিভিসনটাও ভাল থাকবে।'

বলিলাম, 'না ভাই'

চিন্তিতমুখে অনল বলিল, 'আমি ভাবছি কি কর্ব? পালি নিলে একদিক থেকে সুবিধা। পালির মাষ্টারটা মারধোর করে না,— কিন্তু হেডপণ্ডিত শালা বড় পাজী মাইরী—'

বুঝিলাম তাহার পালি লওয়ার প্রতি এত আগ্রহ কেন। বলিলাম 'সংস্কৃতও এমন কি শক্ত? একটু পড়লেই হয়ে যাবে।'

একগাল হাসিয়া সে বলিল, 'দূর—আমি আর তুই কি এক রে? তোর একবার পড়লে হয়ে যায়—আমারত তা হয় না'—বলিয়া এমন চিন্তিত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল যে মনে হইল যেন তাহার জীবনমরণ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে সে।

হাসিয়া বলিলাম, 'নিয়েই দেখ না। ভাল না লাগে ছেড়ে দিবি।'

'তাও তো হয় না—বাবা যে সংস্কৃত নিতে বলেছেন।'

বলিলাম, 'তাহলে বাবার কথাই শোনা উচিৎ।'

'তোর আরকি, তুইত দিব্যি উচিং অর্থে বিধিলিঙ. করে দিয়ে

খালাস্। আর আমি যে এদিকে মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধারয় হয়ে বসে আছি,' বলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, তারপর হাসি থামাইয়া বলিল, 'তুই সংস্কৃত নিবি বলে আমারও নিতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

বলিলাম, 'কেন?'

কিছুমাত্র ইতঃস্ততঃ না করিয়া সে বলিল, 'তোর সঙ্গে বসা যাবে, ইচ্ছামত গল্পসল্প করা যাবে।'

সংস্কৃত নেওয়ার স্বপক্ষে ইহা অপেক্ষা ভাল যুক্তি বোধ হয় সে আর খুঁজিয়া পায় নাই। অতএব সে সংস্কৃতই গ্রহণ করিল এবং আবার নিয়মিত আমার পাশে বসিতে সুরু করিল। পাশে বসিয়া গল্প গুজব বিশেষ করিত না বটে, তবে লক্ষ্য করিতাম—সে আমার পাশে বসিয়া গভীর মনোযোগের সহিত মাষ্টার ছাত্র প্রভৃতির নিদ্রিত অথবা বিকৃত মুখের ছবি আঁকিয়া নিজেই তাহা গভীর অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করিত। ছবি ভাল হইয়াছে মনে হইলে সোৎসাহে আমার হাতে চিমটি কাটিয়া বলিত, 'অরুণ দেখত ঠিক হয়েছে কিনা?'

মাঝে মাঝে এমন এক একটা ছবি সে আঁকিত যাহা দেখিলে আমার পক্ষে হাসি চাপিয়া রাখা কঠিন হইত। আবার সময়ে সময়ে 'বুঝেছিস্ মাইরী', বলিয়া অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প জুড়িয়া দিত। একদিন বিরক্ত হইয়া বলিলাম, 'ক্লাসে বসে অত হাসাসনে অনল? কোনদিন কে দেখে ফেলবে?'

হাসিয়া বলিল, 'দেখলেই বা, তোকে ত আর মারবে না?'

বলিলাম, 'কেন? আমি থার্ড বয় বলে?'

'না, আমি বলব যে আমিই হাসিয়ে দিয়েছি, তাই হেসেছিস্।'

বলিলাম, 'অত সোজা নয়।'

অনল হাসিয়া বলিল, 'দেখিস্।'

সেদিন তাহার কথাটা অবিশ্বাস করিয়াছিলাম। কিন্তু কয়েকদিন

যাইতে না যাইতেই সে প্রমাণ করিয়া দিল যে সে মিথ্যা বলে নাই। সেদিন ইংরেজীর মাষ্টারের অনুপস্থিতিতে আমাদের স্কুলের উর্দ্দুর শিক্ষক শামসুদ্দিন সাহেব আসিলেন ইংরেজী পড়াইতে। ভদ্রলোকের একটা বদ স্বভাব ছিল অকারণে ঘন ঘন মাথা নাড়া। সামসুদ্দিন সাহেব পড়াইতেছেন সহসা অনল কানের কাছে চুপিচুপি মুখ আনিয়া বলিল, 'মাথা নাড়িলে শালাকে ঠিক রাম ছাগলের মত দেখায়—নারে—দেখ্ দেখ্ দাঁড়িটা কেমন নাড়ছে?'

কথাটা হয়ত খুব হাসির নহে, তবু হঠাৎ যেন তাহার কথাটাকে সত্য বলিয়াই মনে হইল। সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে হাসিয়া ফেলিলাম।

শামসুদ্দিন সাহেবের মেজাজটা ছিল কিছু উগ্র। আমায় হাসিতে দেখিয়াই বলিলেন, 'এ্যা ওঃ, কে হাসছে? কি নাম তোর?'

ধরা পড়িয়া গিয়াছি দেখিয়া সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। মনে মনে তখন অনলের মুণ্ডপাত করিতেছি। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, 'উঠে আয়।'

আমি কম্পিত বুকে বেঞ্চি হইতে উঠিয়া গিয়া মাষ্টার মহাশয়ের সামনে দাঁড়াইতেই তিনি হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "হাসলি কেন বল?"

জীবনে মাষ্টার মহাশয়দের হাতে কখনও শাস্তি ভোগ করি নাই। তাই এক হুঙ্কারেই আমার চোখের কোণে জল জমিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি কিছু বলিবার পূর্বেই অনল উঠিয়া দাঁড়াইল।

বলিল, "স্যার, আমি একটা কথা বলি স্যার।"

রোষকষায়িত নেত্রে মাষ্টার মহাশয় তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, 'বল কি কথা?'

স্থিরকণ্ঠে বলিল, 'অরুণের দোষ নেই স্যর। আমিই ওকে হাসিয়ে দিয়েছি।'

মাষ্টার মহাশয় বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, 'তুই হাসিয়ে দিয়েছিস্? কি বলেছিস?'

অনল উত্তর দিল, 'অরুণকে মার্বেন না ত?'

মাষ্টার মহাশয় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, 'চোপরাও, বল কি বলেছিস?'

গর্জ্জন শুনিয়া ক্লাসের সকলেই চমকাইয়া উঠিল। কিন্তু অনল নির্ব্বিকার। তেমনি ভাবেই সে বলিল, 'তাহলে বলব না স্যর।'

এতখানি ধৃষ্টতা মাষ্টার মহাশয় বোধ হয় তাহার দীর্ঘ জীবনে কখনও দেখেন নাই। শান্ত স্বরে কথা কয়টি বলিয়া অনল বসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া তিনি অধৈর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'stand up.'

অনল আবার উঠিয়া দাঁড়াইল।

শামসুদ্দিন সাহেব আমায় বলিলেন, 'তুই যা।'

নত মুখে আমি চলিয়া আসিলাম। অনল তখনও দাঁড়াইয়া আছে। শামসুদ্দিন সাহেব ক্লাসের মনিটারকে একটা কাগজের শ্লিপ লিখিয়া আফিসে পাঠাইয়া দিলেন বেত আনিবার জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে একখানা বেত লইয়া ফিরিয়া আসিল। ক্রুদ্ধ শামসুদ্দিন সাহেব এক হাতে বেতটি ধরিয়া অপর হাতে তাহার অগ্রভাগটুকু বাঁকাইতে বাঁকাইতে অনলকে বলিলেন, 'come here.'

অনল দৃঢ় পদক্ষেপে তাহার সামনে গিয়া দাঁড়াইল। যাইবার সময় তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির স্পষ্ট আভাস দেখিয়া নিজের লজ্জা ভুলিয়া চোখের জল মুছিয়া বিস্মিত নেত্রে তাহার মুখের পানে চাহিয়া ভাবিলাম, কি অদ্ভুত ছেলে! ততক্ষণে অনল শামসুদ্দিন সাহেবের সামনে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কঠিন কণ্ঠে শামসুদ্দিন সাহেব বলিলেন, 'কি বলেছিস?'

অনল নিরুত্তর।

'বল কি বলেছিস?'

অনল বোধকরি কথাটা বলিতে গিয়া আবার হাসিয়া ফেলিল !

মাষ্টার মহাশয় উত্তরোত্তর অধীর হইয়া পড়িতেছিলেন। শাস্তি দিবার সব আয়োজন প্রস্তুত হইয়া থাকা সত্ত্বেও শাস্তিদানের সুবিধা না পাওয়ায় তাঁহার ক্রোধও বোধ করি ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছিল। এবং অনলের অবজ্ঞাজড়িত মৌনতা তাহার অধিকতর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইতেছিল। তাই আর প্রশ্ন না করিয়া বলিলেন, 'হাত পাত্।'

অনল তেমনি নিঃশব্দে হাত বাড়াইয়া দিল। সেই প্রসারিত হাতের উপর সপাং সপাং করিয়া তিন চারি ঘা বেত মারিয়া শামসুদ্দিন সাহেব পুনরায় বলিলেন, 'এখনও বলবি ?'

অনল আবার হাসিয়া বলিল, 'বলব স্যর। কিন্তু বল্লে রাগ কর্বেন না ত !'

প্রত্যুত্তরে আরও কয়েক ঘা বেত মারিয়া মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, 'চাব্‌কে পিঠের চামড়া তুলে দেব, পাজী বদমায়েস ছেলে ; ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে ? বল কি বলেছিস ?'

অনল এক মুহূর্ত্ত কি যেন ভাবিয়া লইয়া হঠাৎ বলিয়া বসিল, 'আপনাকে দেখে আমার রামছাগলের কথা মনে হচ্ছিল স্যর, সেই কথাটা—'

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই শামসুদ্দিন সাহেব যেন দুর্জ্জয় ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন এবং 'কি বল্লি ?' বলিয়া উপর্যুপরি বেত চালাইয়া অনলের শরীরের কোন স্থানই আর অক্ষত রাখিলেন না। তেমন মার আমরা কখনও কেহ দেখি নাই। মনে হইল অনলকে বোধ হয় তিনি আর অক্ষত রাখিবেন না। শেষ পর্যন্ত কি যে হইত বলা কঠিন ; কিন্তু পাশের ঘরে হেডমাষ্টার মহাশয় ক্লাস লইতেছিলেন ; তিনি ছুটিয়া হাজির হইলেন বলিয়াই অনল সে যাত্রা রক্ষা পাইল। হেডমাষ্টার মহাশয় শাস্তির পরিমাণ দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। কেন জানি না

শামসুদ্দিন সাহেব আমায় তিরস্কার করায় যতখানি লজ্জা অনুভব না করিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা আমি সহস্রগুণ লজ্জা এবং বেদনা অনুভব করিলাম অনলের শাস্তির পরিমাণ দেখিয়া। কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিতে না পারিয়া সকলের অলক্ষ্যে বার কয়েক চোখের জল মুছিয়া লইলাম। কিন্তু যাহাকে লইয়া এত কাণ্ড সেই অনলকে যখন হেডমাষ্টার মহাশয় স্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে হুকুম দিলেন তখন সে সোজা উঠিয়া আসিয়া আমার পাশে সশব্দে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'ওফ্—বড় মার মেরেছেরে অরুণ'—এবং শামসুদ্দিন সাহেবের উদ্দেশ্যে যে গালাগালটা ব্যবহার করিল তাহা যে শুধু শালা কথাটি অপেক্ষা অধিকতর মারাত্মক তাহাই নহে, চরম অশ্লীল। আবার ক্লাস শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মুখ তুলিয়া সে সশব্দে হাসিয়া উঠিল। ক্লাশ শুদ্ধ ছেলে নির্বাক বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

সেদিন অন্যান্য ছেলেরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিল এমন নির্লজ্জ ছেলে তাহারা কখনও দেখে নাই। শুধু আমি আশ্চর্য হইয়া ভাবিয়াছিলাম যে এতখানি সহ্য শক্তি সে কেমন করিয়া লাভ করিয়াছিল।

অনলের কথা লিখিতে গিয়া আজ অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। তাহার কথা যে কোনদিন লিখিতে হইবে এ ধারণা কখনও করি নাই। তাই আজ কলম হাতে করিয়া মাথার মধ্যে সব কিছুই উল্টা পাল্টা হইয়া যাইতেছে। সব কথা হয়ত ঠিকমত গুছাইয়া লিখিতে পারিতেছি না। এ পর্যন্ত তাহার সম্বন্ধে যে সব কথা লিখিয়াছি কাহিনী রচনা করিতে বসিয়া হয়ত সে সব অপ্রয়োজনীয় ঘটনাবলী বাদ দেওয়াও চলিত। কিন্তু উপরোক্ত ঘটনা দুইটি কেন জানি না, তাহার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক বলিয়াই মনে হইয়াছিল। তাই সে সম্বন্ধে সামান্য কিছু না লিখিয়া পারিলাম না। রমেনবাবুর হাতে মার খাইবার পর তাহার সহিত পরিচয়ের যে প্রথম ভিত্তি স্থাপনা হইয়াছিল, শামসুদ্দিন সাহেবের

হাতে শাস্তি পাওয়ার পর হইতে সে ভিত্তি দৃঢ়তর হইল। পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত সেদিনের শাস্তির কথা মনে হইলে সত্যিই মনে হইত যে সে শাস্তির অনেকখানি আমারই প্রাপ্য ছিল। যদিও অপরাধটা মূলতঃ অনলেরই এবং সেজন্য তাহার শাস্তি পাওয়া অন্যায়ও নহে অসঙ্গতও নহে। কিন্তু আমার মনে হইত যে সে শুধু আমায় শাস্তির হাত হইতে বাঁচাইতে গিয়াই হাসিমুখে শামসুদ্দীন সাহেবের কঠিন শাস্তি হাত পাতিয়া লইয়াছে। এই কথাটি মনে হইলেই অনুভব করিতাম যে সে তাহার খ্যাতিহীন ব্যক্তিত্বের দ্বারা আমার ভালছেলের সব গৌরবকে নিঃশব্দে পরাজিত করিয়া অনেক উপরে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনে যে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর পরাজয় তাহারই হাতে বরণ করিতে হইবে, সেই কথা তখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। পরবর্ত্তী জীবনে শুধু একবার নয় প্রতিবারই তাহার হস্তে পরাস্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে তাহার কাছে পরাজয় স্বীকার করা আমার মত মানুষের পক্ষে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। কি করিয়া এই কথা বুঝিয়াছিলাম এইবার সেই কথাটাই বলি।

অনলের চেহারার দুঃসহ আকর্ষণ যেদিন হইতে আমায় তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল, সেই দিন হইতেই নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার কাছে তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দিতে সুরু করিয়াছিলাম। ভালমন্দ ভাবিয়া দেখি নাই; দান প্রতিদানের কথাও ভাবি নাই কখনও। এমনি করিয়া নীরব আত্মদানের মধ্য দিয়া অকস্মাৎ একদিন অনুভব করিলাম যে, যে নিষ্ঠুরের কাছে আমি আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছি, কোন দ্বিধা করি নাই, সেই নিষ্ঠুর নিঃশব্দে আমার সব কিছু গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু কোন কিছুই কোনদিন নিজের কাজে লাগায় নাই। যেমন নিঃশব্দে দিয়াছি তেমন নিঃশব্দে সে গ্রহণ করিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত আমার চোখের কয়েক বিন্দু অশ্রু ব্যতীত

তাহাকে দিবার মত আমার কিছুই ছিল না। কিন্তু যাহাকে দিয়াছি সে নিজের প্রয়োজনে কিছুই গ্রহণ করে নাই; গ্রহণ করিয়াছে আমারই তাগিদে। অন্ততঃ আমার ত তাহাই মনে হইত। কারণ শুধু ত আমি নহে—আমারই মত তাহার কাছে সংসারের আরও কতজনের নিঃশব্দে আত্মদান নীরবে অস্বীকার করিয়া একদিন সে সকলের অজ্ঞাতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। প্রতিদানে কেহই তাহার কাছ হইতে কিছু পায় নাই। আমি ব্যতীত আরও যাহারা এই পাথরের মানুষটিকে আত্মদান করিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই ছিল নারী।

তখন আমরা সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি। দুই বছর পরে ম্যাট্রিক দিবার চিন্তাটা আমাদের মুখে বয়সের অনুচিত অনেকখানি গাম্ভীর্য্য আনিয়া দিয়াছিল। সকলেরই অল্পবিস্তর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। অপরিবর্তিত রহিল শুধু অনল। তাহার পরিবর্তনের মধ্যে সে শুধু প্যাণ্ট ছাড়িয়া ধুতি পরিতে সুরু করিল এবং তাহার সাজে পোষাকে ও বাহ্যিক আড়ম্বরের মধ্যে সর্বদাই একটা পরিচ্ছন্নতার আভাস ফুটিয়া উঠিল—এইমাত্র। ইহার বেশী আর কিছু নয়। তাহার চঞ্চল গতিভঙ্গী, অশ্লীল কথাবার্তা, অকারণে উচ্ছসিত হাসি কিছুই কমে নাই।

একদিন কথায় কথায় তাহাকে উপদেশের ছলে বলিলাম, 'আচ্ছা অনল তোর বুদ্ধি আছে একথা সবাই স্বীকার করে, তবু ও তুই পড়তে চাস না কেন বলত? একটু মন দিয়ে পড়লে তুই আমাদের চেয়েও ভাল রেজাল্ট কর্তে পারিস। একটু মন দিয়ে পড়না।'

কথাটা শুনিয়া সে সশব্দে হাসিয়া একচক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিল, 'মাইরী, প্রাণের কথাটা বলে ফেলেছিস্ আমার।'

আমার কথাটাকে সে যে এত সহজ ভাবে লইবে তাহা ভাবি নাই। বলিলাম, 'তোর সব তাতেই ঠাট্টা।'

কৃত্রিম ব্যস্ততার সহিত সে বলিল, 'আহা হা, রাগ করিস্ কেন? ঠাট্টা

করিনি, তবে কি জানিস্—' কথাটা অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়া চুপ করিয়া গেল।

বলিলাম, 'তবে কি ?'

সহসা কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত করিয়া অনল বলিল, 'ভাল লাগে না পড়তে।'

সবিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলাম, 'ভাল লাগে না। কেন ?'

সত্যই আমি যেন স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই যে এমন মানুষও জগতে আছে যাহারা পড়াশোনা করার সর্ববিধ সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও পড়িতে ভালবাসে না।

অনল বলিল, 'কেন ভাল লাগে না? এমনি, মনে হয় পড়ে কি লাভ? কি হবে এত পড়ে ?'

বিস্ময় বাড়িয়া গেল। কারণ তাহার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু অস্বাভাবিকত্ব ছিল যাহার জন্য সে যে রহস্য করিতেছে না তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। সেই সঙ্গে মনে পড়িল রমেনবাবুর প্রশ্নের উত্তরে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে অকপট স্বীকৃতি।

বলিলাম, 'হারে তোর মানুষ হতে ইচ্ছে করে না? বড় হতে ইচ্ছে করে না?'

তেমনি ভাবেই সে উত্তর দিল 'না।'

বলিলাম, 'কি কর্বি বড় হয়ে সে কথা ভেবেছিস কখনও ?'

উদাস কণ্ঠে সে বলিল, 'একেবারেই যে ভাবিনি তা নয়; ভেবেছি কিছু কিছু।'

'ভেবে কি ঠিক কর্লি ?'

প্রদীপ্ত দুই চোখ আমার পানে মেলিয়া ধরিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'একথা কেন জানতে চাস ?'

বলিলাম, 'এমনি, বল্ না।'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অনল বলিল, 'দেখ অরুণ, তুই 'মানুষ হওয়া', 'বড় হওয়া' এসব বলতে কি বুঝিস্ জানি না। তবে আমার সত্যিই কিছু হতে ইচ্ছে করে না।'

বলিলাম, 'তা না হ'ক্; এক একটা মানুষের এক এক একটা ইচ্ছা থাকে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়, কেউ ডাক্তার হতে চায়, কেউ বা—'

বাধা দিয়া সে বলিল, 'দূর ওসব আমি চাই না।'

বলিলাম, 'তবু কি চাস?'

সে বলিল, 'আমি কিছুই চাই না। আমি চাই ঘুরে বেড়াতে। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়াব।'

কথা বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল অন্তরের নিরুদ্ধ আবেগে। যে বয়সের কথা বলিতেছি, সেই বয়সে এমন কথা অনেকেই হয়ত বলিয়া থাকে, তবু কেন যেন তাহার কথাগুলি নিছক রহস্য বলিয়া মনে হইল না। তবুও কিছু না করিয়া দেশ ঘুরিয়া বেড়ানর অদ্ভুত ইচ্ছার হেতুটুকু জানিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

বলিলাম, 'দেশ বিদেশে ঘুর্ত্তে হলে তো টাকার দরকার হবে—টাকা পাবি কোথায়?'

শান্ত কণ্ঠে অনল উত্তর দিল, 'রোজগার কর্ব।'

'কি করে?'

'খেটে। যখন যা দরকার হবে সেই রকম কাজ কর্ব। মুটেগিরি, কুলিগিরি, খালাসী, ইঞ্জিনের ফায়ারম্যান, যা ইচ্ছে হবে—'

কথাগুলি সে এমনি করিয়া বলিল যেন এসমস্ত কাজ তাহার জন্য ঠিক হইয়াই আছে; করিলেই হয়। তাহাকে বুঝাইবার সাধ্য বা শক্তি আমার ছিল না। তাহার বুদ্ধি যে আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী তীক্ষ্ণ তাহা জানিতাম। এমন কি স্বয়ং হেডমাষ্টার মহাশয়ও

বহুবার তাহার অনন্য সাধারণ বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করিয়াছেন। তাই সে যাহা ভাবিতেছে তাহা যে অবাস্তব কল্পনা মাত্র একথা বলিবার মত স্পর্দ্ধা আমার ছিল না। তবু ও একবার শেষ চেষ্টা করিবার জন্য বলিলাম, 'কিন্তু ওরকম ভাবে কতদিন চলবে? দু'চার বছর চলতে পারে—তারপর?'

তেমনি শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে সে উত্তর দিল, 'তারপর? তারপর আর আর ভেবে দেখিনি। তবে মনে হয় তারপর বেশীদিন আমি বাঁচব না।'

এবার আমি হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, 'তুই যে ভূত ভবিষ্যৎ সব ঠিক করে ফেলেছিস্ রে?'

আমায় হাসিতে দেখিয়া সে যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল, বলিল 'তুই হাসলি অরুণ— ? কিন্তু দেখিস্ আমি মিথ্যা কথা বলিনি।'

কথাটা যে তাহার অবিশ্বাস্য একথা সকলেই স্বীকার করিবে। কারণ ছেলেবেলায় অমন কথা অনেকেই বলিয়া থাকে। কিন্তু তখনও বুঝিতে পারি নাই যে কত সহজ ভাবেই সে সেদিন কত বড় সত্য কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল। সেইদিন তাহার কথাটা বিশ্বাস না করিলেও একটা কথা ভাবিয়া আশ্চর্য হইয়াছিলাম যে এই সমস্ত কথা এমন ভাবে বলিবার মত শক্তি সে কোথা হইতে পাইল? পাঠ্যপুস্তকের সহিত সম্পর্ক বিহীন অনল যে চিত্তাকর্ষক উপন্যাস প্রভৃতির প্রতি একান্ত অনুরাগী ছিল তাহা তখনও সঠিক জানিতাম না।

সেকেণ্ড ক্লাশে পড়িবার সময় একদিন কিসের একটা উৎসব উপলক্ষ্যে অনলকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম আমাদের বাড়ীতে। সেখানে সমবেত আত্মীয় স্বজনের মধ্যে তাহার অপূর্ব্ব কণ্ঠ-মাধুর্যের কথা ঘোষণা করিয়া বন্ধুত্ব প্রীতির পরিচয় দিয়া তাহাকে গান গাহিবার জন্য হারমোনিয়ামের সামনে বসাইয়া দিলাম। অনলের কুণ্ঠাহীন ব্যবহার, অদ্ভুত মোহিনীশক্তি এবং সুললিত কণ্ঠস্বরে আত্মীয়স্বজন সকলেই অভিভূত

হইয়া গেল। কিন্তু মুস্কিলে পড়িল আমার ছোট বোন নমিতা। তাহারও গান করিবার কথা ছিল। কণ্ঠস্বর তাহারও নিতান্ত তুচ্ছ নহে। কিন্তু সকলে অনলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল দেখিয়া সে লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল। তাহার বয়স যদিও তখন তেরো—তবুও লজ্জা করিবার মত বয়স সেটা তাহার নহে। কিন্তু মা যখন নমিতাকে গান গাহিতে বলিলেন তখন নমিতা কোন কথা না বলিয়া মাটির দিকে মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। সকলের অনুনয় বিনয়েও সে মুখ তুলিয়া চাহিল না।

হঠাৎ অনল তাহার ডানহাতটা খপ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, 'ওরে দুষ্টু মেয়ে, গান শুনবার বেলায় শুনতে পার আর গাইবার বেলায় বুঝি লজ্জা করে? না? সেটি হবে না। গান তোমায় গাইতেই হবে। লজ্জা কর্লে ছাড়ছি না।'

নমিতা শুধু মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'ছাড়ুন লাগছে।'

অনল বলিল, 'বল গান কর্বে?'

শেষ পর্যন্ত অনলের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে কোন রকমে একটা গান করিয়া নমিতা দ্বিগুণ লজ্জায় লাল হইয়া ঘর হইতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। সকলেই সেই তেরো বছরের মেয়ের লজ্জা দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু কেন যে সে এতখানি লজ্জা পাইয়াছিল সে কথাটা কেহ তখন ভাবিয়া দেখেন নাই। প্রয়োজনও বোধ করে নাই বোধ হয়। এবং অনল বাড়ী যাইবার সময় দ্বিতলের জানালা হইতে মুগ্ধ দৃষ্টিতে নমিতা যে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল, একথাটাও কেহ জানিল না।

শুনিয়াছি মানুষের মনটা নাকি একটা বিস্ময়ের বস্তু। বিশেষতঃ নারীর মন। তাহাদের অতলস্পর্শী মনের তলায় প্রতি মুহূর্তে যে কি ঘটিতেছে কেহই তাহার কোন হদিস পায় না।

দিন কয়েক পরে হঠাৎ একদিন নমিতা আমায় বলিল, 'আচ্ছা ছোড়দা, তোমার সেই বন্ধুটি আর আসে না?'

বলিলাম, 'কে অনল ?'

নমিতা বলিল, 'হ্যাঁ।'

বলিলাম, 'ডাকলেই আসবে। কেন গান শুনবি ?'

সস্মিতমুখে সে ঘাড় নাড়িল।

'তাহলে তোকেও ত গান শুনাতে হবে।'

নমিতা মাথা নাড়িয়া বলিল, 'আমার বড় লজ্জা করে যে—'

ঠাট্টা করিয়া বলিলাম, 'হুঁ! এতটুকু মেয়ের আবার লজ্জা! আচ্ছা বলব অখন অনলকে একদিন আসতে।'

শুধু নমিতা নহে মাও তাহাকে আরেকদিন আনিবার জন্য বলিলেন। অনলকে মায়েরও বড় ভাল লাগিয়াছিল। অনলের যে মা বাঁচিয়া নাই এই খবরটা পাইয়া বোধ হয় তাঁহার মাতৃ হৃদয়ের গভীর তলদেশে সেই মাতৃস্নেহ বঞ্চিত সুদর্শন বালকটির জন্য গোপন স্নেহ জাগিয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয় দিন অনলকে আনিবার পর হইতে অনল প্রায়ই আমাদের বাড়ী আসিত। সময়ে অসময়ে কারণে অকারণে তাহার আগমন আমাদের বাড়ীতে প্রায় নিয়মিত হইয়া উঠিল। এবং অনলের সম্বন্ধে বাড়ীর লোকের যে ধারণা হইয়াছিল তাহা এক কথায় ব্যক্ত করিলে বলা যায় অদ্ভুত ছেলে।

নিয়মিত আশা যাওয়ার ফলে অনল সম্বন্ধে বাড়ীর লোকেরা আর বিশেষ কিছু চিন্তা করিতেন না। অথবা নমিতার সহিত তাহাকে এক সঙ্গে বসিয়া গান করিতে দেখিলে কেহ কোন মন্তব্যও করিতেন না। কারণ দুইটি অপরিণত বুদ্ধি বালক বালিকাকে লইয়া অযথা চিন্তা করিবার মত সময় কাহারও ছিল না।

এমনি করিয়া দুইটা বছর কাটিয়া গেল। তখন সবে মাত্র ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছি। নমিতার বিবাহের জন্য খুব আয়োজন চলিতেছে। অনলও সবেমাত্র কলেজে ভর্তি হইয়াছে। কলেজ তখনও সুরু হয় নাই।

ম্যাট্রিকে অনল থার্ড ডিভিশনে পাশ করিয়াছে বলিয়া আমাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। অনেক সাধ্য সাধনা করিয়াও তাহাকে আমাদের বাড়ীতে আনিতে পারি নাই। না আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, 'ভাল লাগল না।' কয়েকবার বলিয়া আমিও হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলাম।

নমিতার বিবাহের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পাত্র স্থির হইয়া গিয়াছে, কয়েকদিন পরেই পাত্র পক্ষ আসিয়া যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবেন। ইহার ভিতরে একদিন সন্ধ্যাবেলা আমার ঘরে বসিয়া কি যেন একটা করিতেছিলাম। সহসা নমিতা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। এই কয়দিনে তাহার মুখের ভাবে একটা পরিবর্ত্তন বাড়ীর সকলেরই চোখে পড়িয়াছিল। বাড়ীর অন্যান্য সকলের মত আমিও ভাবিয়াছিলাম যে বিবাহের কথাবার্তা শুনিয়া মেয়েদের যেমন একটা স্বাভাবিক পরিবর্তন হয়, ইহাও তেমনি একটা কিছু। কিন্তু আমার ধারণা যে কত বড় ভুল তাহা সেই দিন প্রথম উপলব্ধি করিলাম।

নমিতা ঘরে ঢুকিয়া দরজাটা সন্তর্পণে বন্ধ করিয়া দিয়া টেবিলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত মুখখানা শ্রাবণের আকাশের মত গম্ভীর। কি যে ঘটিয়াছে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নির্বাক বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম, কিন্তু কোন কথাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। নমিতাই নীরবতা ভঙ্গ করিল।

বলিল, 'ছোড়দা তোমায় একটা কথা বলতে এসেছি।'

আবিষ্টের মত বলিলাম, বল।'

লক্ষ্য করিলাম কথা বলিতে গিয়া তাহার ওষ্ঠ প্রান্ত কাঁপিয়া উঠিল।

নমিতা বলিল, 'ছোড়দা এ বিয়ে আমি কর্ব না।'

নমিতার কথায় আমি শিহরিয়া উঠিলাম। মনে হইল স্বপ্ন দেখিতেছি। নমিতা স্বভাবতঃই লাজুক প্রকৃতির। বেশী কথা বলা বা বাজে কথা বলা

তাহার স্বভাব নহে। চার ভাই বোনের মধ্যে সে সবচেয়ে ছোট। এবং একটিমাত্র বোন বলিয়া সকলেরই বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিল সে। অন্যান্য ভাইদের অপেক্ষা তাহার আব্দারটা আমাকেই সহ্য করিতে হইত বেশী। কিন্তু তাই বলিয়া একি অদ্ভুত অনুরোধ।

বলিলাম, 'কি বলছিস্ নমি? বিয়ে কর্বি না মানে?'

বারকয়েক মাথা নাড়িয়া বলিল, 'এ বিয়ে আমি কর্তে পার্ব না।'

বলিলাম, 'কি হয়েছে তোর?' এ বিয়ে কর্বি না কেন? কেউ কিছু বলেছে তোকে?'

মাথা নাড়িয়া সে জানাইল কেহ কিছুই বলে নাই। একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া আমি বলিলাম, 'তবে?'

সে কোন কথা না বলিয়া বাম হাতে তর্জ্জনীর প্রান্তভাগ দিয়া টেবিলটা খুঁটিতে লাগিল। চেয়ার হইতে উঠিয়া গিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলাম, 'কি হয়েছে বলত?'

সহসা সে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের আবেগে আমার বুকের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল। একটা অজ্ঞাত বিপদাশঙ্কায় আমার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। সস্নেহে তাহাকে বিছানার উপর বসাইয়া বলিলাম, 'বল ত কি হয়েছে তোর? আমার কাছে কিছু লুকোসনে?'

সে তেমনি করিয়া আমার বুকের মধ্যে লুকাইয়া অশ্রুজড়িত কণ্ঠে শুধু বলিল, 'এ বিয়ে তুমি ভেঙ্গে দাও ছোড়দা—এ বিয়ে আমি কিছুতেই কর্ব না—আমি আত্ম হত্যা কর্ব।'

বয়স তখন আমার মাত্র আঠার। সংসার সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তখন হয় নাই। তাই নমিতার কথার কোন অর্থ করিতে না পারিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। কিন্তু কি যে হইয়াছে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। নমিতাও কিছু বলে না। কেবল কাঁদে। একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। কারণ মা হয়ত এই

সময় জলখাবার আনিয়া হাজির করিবেন এবং অসময়ে নমিতাকে কান্নাকাটি করিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কি যে জবাব দিব ভাবিয়া পাইলাম না। তাই অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া অনেক বুঝাইবার পর নমিতা উঠিয়া বসিলে বলিলাম, 'কি হয়েছে কিছু না বলে শুধু কাঁদলে কি হবে বল ত? বল কি হয়েছে। যদি পারি এ বিয়ে যাতে না হয় আমি তার চেষ্টা কর্ব—কিন্তু তোর কি হয়েছে তাত বলবি?'

নমিতা যেন সকল সঙ্কোচ জোর করিয়া কাটাইয়া বলিল, 'আমি অনলদাকে বিয়ে কর্ব।'

একান্ত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। বিস্মিত হইবার হয়ত কিছুই ছিল না। কারণ এমন ঘটনাত কতই ঘটিতেছে। কিন্তু আমার আঠার বৎসর বয়সের মধ্যে এরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার মত সুযোগ আসে নাই কখনও। বিশেষ করিয়া এইরকম অভিজ্ঞতা। তাহা না হইলে নমিতার কথা শুনিয়া কেন মনে হইল, যে এই অল্প কয়দিনের পরিচয়ের মধ্যে কি করিয়া যে সে তাহার কুমারী চিত্তের প্রথম অর্ঘ্য স্বল্প পরিচিত একজনের পায়ে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে কে জানে? এমনি করিয়া সকলের দৃষ্টির অন্তরালে বসিয়া কখন যে সে অনলের কাছে আত্মদান করিয়া বসিয়াছে কেহই সে সংবাদ রাখে নাই। হয়ত বা কেহ ভাবিতেও পারে নাই।

ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'অনল জানে একথা?'

নমিতা বলিল, 'না।'

একটা স্বস্তির নিংশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, 'তবে কি করে জানলি যে সে তোকে বিয়ে কর্বে? তাছাড়া বিয়ের কোন যোগ্যতাও তার নেই।'

নমিতা আমার কথা শুনিল কিনা অথবা শুনিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিল কিনা জানিনা। কিন্তু আমার কথার উত্তরে আর কোন কথাই সে বলিল না।

অনলকে ভালবাসিতাম সে কথা সত্য এবং তাহার প্রতি স্নেহও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু নমিতা যখন সমস্ত সঙ্কোচ কাটাইয়া সহসা তাহাকে বিবাহ করিবার কথা নিজমুখে প্রকাশ করিল তখন যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কারণ পারিবারিক জীবনে আমার স্থান অনেক নীচে, এবং আমার গুরুত্বও নিতান্ত তুচ্ছ। আমার বড় দুই ভাই, তাহারাই তখন কলেজের পড়া শেষ করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার উপর নমিতা আমায় যে অনুরোধ করিয়া বসিল সেই অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না। শুধু মাত্র স্নেহের দাবীতে সেই অনুরোধ রক্ষা করার চেষ্টা পর্যন্ত অসম্ভব ছিল। আমার মতামতের উপর পিতামাতার সুনিশ্চিত কার্যকলাপের যে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিবে না, একথা বুঝিবার মত বুদ্ধি আমার ছিল। বিবাহ-সংক্রান্ত ব্যাপারে আঠার বৎসরের স্বল্পবুদ্ধি বালকের মতামত যে কোন অবস্থাতেই আমাদের সমাজে গ্রহণীয় নহে ইহা বুঝিতাম। নমিতার পক্ষ লইয়া কোন কথা বলিতে গেলে পিতামাতা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের হাতে যে নিদারুণ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে, সেই কথাটা স্মরণ করিয়াই সবচেয়ে বেশী চিন্তিত হইলাম।

নরনারীর মধ্যে হৃদয়দানের প্রথাটা যে আমাদের সমাজে সম্পূর্ণ অচল এ তথ্যটা বুদ্ধি অপরিপক্ক হওয়া সত্ত্বেও সংস্কারের বশেই বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছিলাম। অথচ নমিতাকে সান্ত্বনা দিবার মত কোন কথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। এক একবার মনে হইতেছিল যাহা হইবার হইবে অনলকে সব কথা খুলিয়া বলি। কিন্তু পরমুহূর্তে নারীদের সম্বন্ধে অনলের অশ্রদ্ধাজনক অশ্লীল এবং আপত্তিকর মন্তব্যগুলির কথা স্মরণ করিয়া মনটা তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিতে লাগিল। কি যে করিব কিছু ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না।

আমায় কোন কথা বলিতে না দেখিয়া নমিতা ধীরে ধীরে চোখ

মুছিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই শেষ চেষ্টা করিবার জন্য বলিলাম, 'আচ্ছা নমি, অনল যদি বিয়ে কর্ত্তে না চায়; যদি বলে—?'

বাধা দিয়া নমিতা বলিল, 'আমি ত তোমায় সবই বলেছি ছোড়দা। এখন তোমার ইচ্ছা হয় তাঁকে সব কথা বলতে পার। আর যদি তুমি না পার তাঁকে ডেকে দাও আমি নিজেই সব কথা বলব।'

সভয়ে বলিলাম, 'তুই নিজে বলবি? লজ্জা কর্বে না তোর?'

ওষ্ঠের একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া নমিতা বলিল, 'লজ্জা? না লজ্জা কর্বে না।'

মনে হইল এ যেন আমার লাজনম্রা ছোট বোন নমিতা নহে; এ বোধহয় অন্য কেহ। তখনও বুঝি নাই যে, যে বস্তু তাহার কুমারী চিত্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া দিয়াছে তাহার গতিবেগ কত দুর্বার—কত দুঃসহ তার আবেগ।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া বলিলাম, 'আচ্ছা অনলকে আমি বলব; দেখি সে কি বলে?'

নমিতা চলিয়া গেল।

পরবর্ত্তী জীবনে অনেক সময় অনেক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি; কিন্তু জীবনের প্রারম্ভে এই প্রণয়ঘটিত সমস্যার মত কঠিন সমস্যার সম্মুখীন আর কখনও হইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। নমিতা এবং অনল দুইজনেই ছিল আমার স্নেহের পাত্র। এই স্নেহের পরিমাণ নির্ণয় করিবার কোন উপায় যদি থাকিত তাহা হইলে হয়ত মুস্কিলে পড়িতাম। তাই সেইদিন সন্ধ্যায় যখন নমিতা তাহার কুমারী চিত্তের কঠিনতম সমস্যাটি অসঙ্কোচে আমার কাছে প্রকাশ করিয়া সমাধানের জন্য আমার সাহায্য প্রার্থনা করিল তখন সত্যই বিচলিত হইয়া পড়িলাম। অনলের সহিত পরিচিত হইবার দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহার সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া না দেখিবার জন্য নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগিলাম।

মনে হইল অনলকে যেন চিনিতে পারি নাই। চিনিবার চেষ্টাও করি নাই। অথচ আজ এমনই এক অবস্থার সম্মুখীন হইলাম যে সে অবস্থার হাত হইতে অক্ষত অবস্থায় নিষ্কৃতি পাইবার উপায় কাহারও নাই। অনলের নাই, নমিতার ত নহেই, আমারও নহে। এলোমেলো চিন্তার রাশি মনের ভারবৈষম্য সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া দিল। শেষ পর্যন্ত আর কিছু চিন্তা করিতে না পারিয়া আলনা হইতে জামাটা টানিয়া লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সোজা অনলের কাছে চলিয়া গেলাম।

অনল তাহাদের সদর দরজার কাছে উবু হইয়া বসিয়া নিজের পোষা কুকুরটাকে লইয়া আপনার মনে খেলা করিতেছিল। আমায় দেখিয়া সহজ ভাবেই বলিল, 'আয় কি খবর ?'

বলিলাম, 'তোর সঙ্গে বিশেষ জরুরী কথা আছে অনল ?'

আমার কণ্ঠস্বরে চাঞ্চল্যের আভাস পাইয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া সে বলিল, 'বাপরে ! এত লোক থাকতে শেষে আমার সঙ্গে তোর জরুরী কথা ?'

তাহার কথা বলার ধরণে মনে হইল সে যেন আমার চাঞ্চল্যটুকু সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া গেল।

বলিলাম 'আমার সঙ্গে একটু বেরুতে হবে তোকে ?'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া সে বলিল, 'কি ব্যাপার বল ত ?'

বলিলাম, 'চল—বলছি।'

'চল।'

দুইজনে গঙ্গার তীরে একটা নির্জ্জন স্থানে গিয়া বসিলাম।

অনল বলিল, 'বল কি তোর জরুরী কথা ?'

বলিলাম, 'বলছি।'

কিন্তু বলিতে গিয়া মনে হইল, কি বলিব।

আশ্চর্য মানুষের মন। উত্তেজনার মুহূর্তে যে চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছি, সেই উত্তেজনা স্তিমিত হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাছেই নিজের চাঞ্চল্য অত্যন্ত হাস্যকর বলিয়া মনে হইল, এবং কি বলিব ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না।

আমায় চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অনল আমার কাঁধে একটা হাত রাখিয়া বলিল, 'বল কি বলবি ?'

কি বলিব না বলিব কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া সহসা বলিয়া ফেলিলাম—'আচ্ছা অনল তুই জীবনে বিয়ে কর্বি না ?'

কথাটা শুনিয়াই অনল সশব্দে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, 'তোর হঠাৎ কি হয়েছে বল ত ? নেশা টেশা করেছিস নাকি ?'

আমার কথাটা যে সত্যই সে অবস্থায় হাস্যকর সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কথাটা বলিয়া ফেলিবার পর মুহূর্তেই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু অনলের হাসিটা যেন বড় বেশী শ্রুতিকটু বলিয়া মনে হইল।

বলিলাম, 'কথাটা শুনে হেসে উঠলি যে ?'

সে তখনও হাসিতেছিল। হাসিতে হাসিতেই বলিল, 'হাস্ব না ? বলিস্ কি ?'

বলিলাম, 'হাসতে হয় পরে হাসিস্। যা জিজ্ঞেস কর্লাম তার উত্তর দে।'

অনল বলিল, 'যদি বলি বিয়ে কর্ব না ? বিশ্বাস কর্বি ?'

বলিলাম, 'না বিশ্বাস করার কি আছে ? তা ছাড়া আমি শুধু জানতে চাই যে তুই কোন দিন বিয়ে কর্বি কিনা ?'

সে বলিল, 'কোনদিনের কথা এখন কি করে বলব ? তোকে যদি জিজ্ঞেস করি তুই জীবনে বিয়ে কর্বি কিনা, তুই কি বলবি ?'

বলিলাম, 'কি আর বলব ? বিয়ে কর্ব এইটাই বলব।'

আবার সে হাসিয়া উঠিল বলিল, 'তাই বল। তোর বুঝি বিয়ের কথা হয়েছে ?'

এবার বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিলাম, 'তুই তাহলে ছ্যাবলামি কর, আমি চলি।'

সে তৎক্ষণাৎ আমার একটা হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, 'চটে গেলি কেন ? বস্ বস্, বলছি।'

আবার বসিলাম।

সহসা কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত করিয়া সে বলিল, 'জানিনা কেন তুই একথা আমায় জিজ্ঞেস কলি ? একথার উত্তর যে এভাবে কাউকে দিতে হবে আমি ভাবিনি। তা তুই যখন জিজ্ঞেস কলি তখন মিথ্যা কথা তোকে বলব না ? দেখ বিয়ে করার ইচ্ছে আমার বিশেষ নেই ?'

মনে মনে নমিতার কথাটা স্মরণ করিয়া বলিলাম, 'হুঁঃ তারপর ?'

অনল বলিল, 'আমি নিজেও যে একথাটা নিয়ে ভাবিনি তা নয়—ভেবেছি এবং বুঝেছি যে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হবে না।'

বলিলাম, 'কেন ?'

'তার কারণ নিজের জীবন সম্বন্ধে নিজেই এখনও নিশ্চিন্ত হতে পারিনি—কোন দিন পারব কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। কারণ জীবনে কিছু করার ইচ্ছে আমার নেই তাত জানিসই।'

বলিলাম, 'জানি।'

তেমনি নির্লিপ্ত কণ্ঠেই সে বলিয়া চলিল, 'তাই জীবনে বিয়ে করার চিন্তা আমি মনেও স্থান দিতে পারিনা।'

তাহার যুক্তিগুলি যে খুব তীক্ষ্ণ নহে তাহা বেশ বুঝা যায়।

বলিলাম, 'এমনও ত হতে পারে যে তুই কোন মেয়েকে ভালবেসে ফেলি ?"

আবার সে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'তুই পাগল হয়েছিস? আমি যাব একটা মেয়েকে ভালবাসতে। অত বোকা আমি নইরে?'

ভালবাসার মধ্যে নির্বুদ্ধিতার কি থাকিতে পারে তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমি বলিলাম, 'এর মধ্যে বোকামির কি আছে?'

হাসিয়া অনল বলিল, 'নেই? আছে বৈকি? ভালবাসা মানেই বোকামি। আর তা ছাড়া একটা মেয়েকে ভালবেসে আমার কি লাভ? মেয়েদের মধ্যে আছে কি?'

ক্ষণেকের জন্য একবার নমিতার মুখখানি মনে পড়িয়া গেল।

বলিলাম, 'মেয়েদের কি কিছুই নেই?'

অত্যন্ত অবজ্ঞার সহিত সে বলিল, 'কিস্‌সু না—কি আছে? আর যা আছে তাতে সাময়িক উত্তেজনার তৃপ্তি পাওয়া যেতে পারে—কিন্তু তার জন্যে বিয়ে করার কোন প্রয়োজন নেই।'

একান্ত বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলাম, 'বলিস্ কি?'

'ঠিকই বলছি। অন্ততঃ আমারত সেই মনে হয়।'

'তাহলে বিয়ে তুই কর্বি না?'

প্রত্যুত্তরে মাথা নাড়িয়া সে বলিল, 'মনে ত হয় না।'

'ধর যদি একটা মেয়ে তোকে ভালবাসে?'

একটা ঘাসের ডগা ছিঁড়িয়া লইয়া দাঁত দিয়া কাটিতে কাটিতে অনল উত্তর করিল, 'সে আর নূতন কি?'

'তার মানে? তুই এর আগে কোন মেয়েকে ভালবেসেছিস?'

অনল বলিল, 'না আমি ভালবাসিনি—তবে একটা মেয়ে এরই মধ্যে আমায় ভালবেসেছে। কিন্তু তাই বলে কি তাকে বিয়ে কর্তে হবে নাকি?'

তাহার কথাগুলির মধ্যে এমন একটা শ্লেষ এবং অবজ্ঞার আভাস ছিল যে, তাহার কথা শুনিতে শুনিতে উত্তরোত্তর মনের মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক হইতেছিল।

বলিলাম, 'সে মেয়েটি জানে যে তুই তাকে বিয়ে করবি না?'

ঘাড় নাড়িয়া জানাইল মেয়েটি জানে।

বলিলাম, 'তবুও তোকে ভালবাসে।'

তেমনি ভাবেই সে বলিল, 'হ্যাঁ বাসে।'

সদীর্ঘশ্বাস বলিয়া উঠিলাম, 'আশ্চর্য!'

হাসিয়া অনল বলিল, 'আশ্চর্যের কি আছে? মেয়েরাত ভালবাসবেই।'

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'তার মানে?'

সে একটু হাসিয়া বলিল, 'মানে আবার কি? যে মানুষটার রূপ আছে, টাকা আছে, সংসারে প্রতিপত্তি আছে তাকে ত মেয়েরা ভালবাসবেই।'

বিস্তার কথাটা আর বলিল না। বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই এড়াইয়া গেল।

আবার প্রশ্ন করিলাম, 'এ ছাড়া আর কিছুই মেয়েরা চায় না?'

উত্তরে সে বলিল, 'না। মেয়েরা অত বোকা নয়।'

নারীদের সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা কতখানি ছিল জানি না, কিন্তু আমার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না। তবুও মেয়েরা যে অর্থ প্রতিপত্তি এবং রূপ ব্যতীত অন্য কিছুই চাহে না বা চাহিতে পারে না, এই কথাটা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

তাই প্রতিবাদের স্বরে বলিলাম, 'এমনও ত হতে পারে যে একটা মেয়ে কিছু না জেনেই তোকে ভালবাসল?'

বাধা দিয়া সে বলিল, 'তা হয় না। যদিও হয়, বুঝব নিশ্চয়ই সে আমার বাবার অবস্থা জানে—।' বলিয়া একটু হাসিল।

সে হাসিল বটে, কিন্তু মনে হইল তাহার সে হাসি আমার অন্তরের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চিরিয়া দিয়া গেল। এবং তাহার সম্বন্ধে সঞ্চিত স্নেহ ক্রমশঃ নিঃশেষ হইয়া গিয়া ঘৃণায় রূপান্তরিত হইতে লাগিল।

বলিলাম, 'বিয়েরও একটা প্রয়োজন আছে, এটা স্বীকার করিস্ ত।'

বলিল, 'হ্যাঁ।'

প্রশ্ন করিলাম, 'তবে ?'

সে উত্তর দিল, 'ঐত বল্লাম, বিয়ের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে বিয়ে করাই অবশ্য কর্ত্তব্য নয়। প্রয়োজন মেটাবার অন্য উপায় আছে।'

ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম, 'মেয়েদের তাহলে তুই খেলার সামগ্রী বলে মনে করিস্ অনল ?'

কথাটা যেন খুবই হাসির কথা হইল। সে হাসিতে হাসিতে বলিল 'তোর অনুমান নেহাৎ মিথ্যা নয়। মেয়েদের কোন মূল্যই নেই আমার কাছে। যেটুকু বা আছে সেটুকু সামান্যই' বলিয়া একটা ইঙ্গিতপূর্ণ অঙ্গভঙ্গী করিল। আমিও আর কোন কথা বলিতে পারিলাম না।

জীবনের উষাকালে অল্পবয়স্ক একটি যুবককে অসঙ্কোচে দুর্নীতির জয়গান গাহিতে শুনিয়া মাথার মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল হইয়া গেল। ভাবিলাম এ কোন সৃষ্টিছাড়া মানুষের মায়াস্পর্শে আসিয়াছি, যে জীবনের স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইয়া সগর্বে বাঁচিয়া থাকিতে চায় ? একবার ভাবিলাম নমিতার কথা আগাগোড়া খুলিয়া বলি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়িল, আমার সহিত কথা বলিবার সময় মেয়েদের সম্বন্ধে তাহার কঠিন অবজ্ঞাজড়িত বিদ্রূপাত্মক কথাবার্ত্তাগুলি। নমিতার কথা মনে করিয়া রাগও হইল, দুঃখও হইল। ভাবিলাম, এ কোন লক্ষীছাড়া অন্তঃকরণহীন পাষণ্ডের পায়ে নমিতা তাহার কুমারী হৃদয়ের প্রথম অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া নিজের জীবনের সার্থকতার সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে ? সে ইহার বাহ্যিক রূপের মোহে মুগ্ধ হইয়া অসঙ্কোচে আত্মদান করিয়া বলিয়া ফেলিল, ইহাকে ছাড়া কাহাকেও সে বিবাহ করিবে না। অথচ এই হৃদয়হীনের অন্তরে আঘাত করিয়া করুণা ভিক্ষা করার ব্যর্থ প্রচেষ্টার লজ্জা সে গোপন করিবে কি দিয়া ? ঐ যে মানুষটি কলধ্বনি মুখরিত

গঙ্গারপানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া আছে, উহার কাছে নারীর কোন মূল্যই নাই, নারীর আত্মদান উহার কাছে অর্থহীন পরিহাসের সামগ্রী; নারীর প্রেম উহার কাছে হাস্যকর মনোবিকার মাত্র। মনে হইল কি অপাত্রেই না নমিতা তাহার মন সমর্পণ করিয়াছে! কথাটা মনে হইবা-মাত্র নিজের অজ্ঞাতসারেই একটা প্রচণ্ড দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

অনল চকিত হইয়া বলিল, 'কি হল রে?'

মনের আশা ও আবেগকে কঠোর হস্তে দমন করিয়া বলিলাম, 'নাঃ, কিছু নয়। চল বাড়ী ফেরা যাক্।'

বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে অনুভব করিলাম, মনের মধ্যে যেন ধীরে ধীরে একটা গুরুভার জমিয়া উঠিতেছে—সেই ভার নিঃশব্দে বহন করার মত শক্তি আমার নাই। বাড়ী ফিরিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া আসিলাম। পরদিন ভাবিলাম নমিতাকে সব কথা খুলিয়া বলিব। কিন্তু কেন জানি না তাহা পারিলাম না। একটা অপরিসীম সঙ্কোচ অহর্নিশি আমার কণ্ঠরোধ করিয়া রাখিল। নমিতাকে কিছুই বলিতে পারিলাম না। নমিতাও কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। একবার ভাবিলাম হয়ত বা উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে যেটুকু দৌর্ব্বল্য সে আমার কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে, উচ্ছ্বাস কমিয়া যাওয়ায় পরমুহূর্তে সেই দৌর্বল্যের কথা স্মরণ করিয়া সে নিজেই লজ্জিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা শুধুই আমার অনুমান।

দিন কয়েক পর যথাসম্ভব আড়ম্বরের সহিত নমিতার আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল। নমিতার মুখের ভাবে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম না। এবং ক্রমশঃ বিবাহের দিনও আসিয়া পড়িল।

মা আমায় ডাকিয়া বলিলেন, 'তোর বন্ধু অনলকে নেমন্তন্ন করবি না অরুণ?'

মায়ের প্রশ্নে যেন আঘাত পাইয়া চকিত হইয়া উঠিলাম। বলিলাম, 'হ্যাঁ তা কর্ব।'

অনলকে নিমন্ত্রণও করিলাম। বিবাহের দিনে প্রচুর আনন্দোৎসবের মধ্যে প্রতিমুহূর্ত্তে একটা অজ্ঞাত বিপদাশঙ্কায় মনের কথাটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিতে লাগিল। ভাবিলাম শেষ পর্যন্ত হয়ত একটা অঘটন ঘটিয়া যাইবে। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটিল না। যথারীতি বিবাহ হইয়া গেল।

মনে হইল নমিতাকে যেন আর এক অদ্ভুতরূপে দেখিলাম। চন্দন চর্চিত পট্টবাস পরিহিতা নমিতা যখন বধূর সাজে বিবাহ আসরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সহসা মনে হইল এ বিবাহটা যেন ঠিক হইল না। কোথায় যেন একটা মারাত্মক ত্রুটি রহিয়া গেল। কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। বিবাহের পরদিন নমিতা ও তাহার স্বামীর পাটনা রওনা হইবার কথা। উদ্যোগ আয়োজন সব প্রস্তুত। নমিতা একে একে সকলকে প্রণাম করিয়া আমার কাছে আসিল। এবং আমাকেও একটা প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষণিকের জন্য আমার মুখের পানে চাহিল—পরক্ষণেই দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বেশ বুঝিলাম সে আমায় কিছু বলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। সেদিন সে বলিতে পারে নাই বটে, কিন্তু অনেকগুলি দিন বাদে যখন তাহারই অব্যক্ত কথাগুলি আরেকজনের মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল, সেদিন আমিই নীরব হইয়া গিয়াছিলাম, এবং আজিকার বিদায়গামী নমিতার আয়ত চোখের মৌন ভাষার অর্থ সেদিন যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। সে কথা এখন যাক্—যথাস্থানে বলা যাইবে। এখন যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি।

সেই রাত্রে নমিতাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া অজ্ঞাত খেয়ালের বশে অনলের কাছে গিয়া হাজির হইলাম। তখন রাত্রি দশটা বাজে।

অনলকে ডাকিতেই চাকরটা দরজা খুলিয়া দিয়া জানাইল অনল তাহার শোবার ঘরেই আছে। অনলের বাড়ীতে আমার অবাধগতি ছিল। সোজা তিন তলায় উঠিয়া গেলাম। অনলের দরজা ঠেলিতেই বুঝিলাম, দরজা ভিতর হইতে বন্ধ আছে। দরজায় আঘাত করিতেই ভিতর হইতে উত্তর আসিল 'কে ?'

উত্তর দিলাম, 'আমি অরুণ।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর অনল দরজা খুলিয়া দিল। এবং দরজা খুলিতেই একটা বিশ্রী গন্ধ নাকে আসিতে গা পাক দিয়া উঠিল। গন্ধটা কিসের সেই সম্বন্ধে কোন চিন্তা করিবার পূর্বেই দেখি সামনের টেবিলের উপরে একটা বোতল, তাহার গায়ে অন্যান্য কথার শেষে লেখা whisky, বোতলটায় তখনও অর্দ্ধেক-পানীয় রহিয়াছে এবং একটা গেলাসে কিছুটা ঢালা হইয়াছে। বিস্মিত বিমূঢ় দৃষ্টিতে অনলের মুখের পানে চাহিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। অনল একটু হাসিল। সে হাসি কিন্তু অনলের স্বাভাবিক হাসির মত শ্লেষাত্মক বলিয়া মনে হইল না। বরং মনে হইল সে হাসি যেন বড় করুণ, বড় বেদনাদায়ক। তাহার চোখের দৃষ্টিও বড় ম্লান, বড় বিষণ্ণ। ভাবিলাম বোধ করি নেশা করার জন্যই অমন হইয়াছে। আমার মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া অনল বলিল, 'কি রে দাঁড়িয়ে থাকবি না ভিতরে আসবি ?'

যন্ত্র-চালিতের মত একটা চেয়ারে গিয়া বসিলাম। দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া অনল সামনের চেয়ারটায় বসিয়া টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া গ্লাসটা হাতে লইয়া চুমুক দিতে দিতে বলিল, 'তারপর বন্ধুবর কি খবর ?'

তখনও সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর বলিলাম, 'এটা আবার কবে থেকে সুরু কলি ?'

হাসিতে হাসিতে অনল বলিল, 'মাত্র কাল সন্ধ্যা থেকে। তবে ঠিক সুরু করিনি।'

বলিলাম, 'তার মানে ?'

'হঠাৎ কাল খেয়াল হল মদ খেতে কি রকম লাগে, খেয়ে দেখব। তাই দুটো বোতল কিনেছিলাম। কাল একটা বোতল খেয়েছি আর আজ এই বোতলটা শেষ কর্ব !'

মনের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সন্দেহ জাগিল। বলিলাম, 'হঠাৎ কাল সন্ধ্যাবেলায় অমন অদ্ভুত খেয়াল হবার মানে ?'

কি যেন একটা বলিতে গিয়া সে নিজেকে সামলাইয়া লইল। বলিল, 'খেয়ালের মানেটা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি—পার্লে জানাব। কিন্তু তুই এমন অসময়ে যে ?'

বলিলাম, 'অমনি, নমিতাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে ফির্তে ফির্তে হঠাৎ মনে হল—'

বাধা দিয়া স্বাভাবিক স্বরে অনল প্রশ্ন করিল, 'নমিতা আজই গেল ? কাল ভাবলাম একবার যাই, কিন্তু,' বলিয়া হাসিয়া মদের বোতলটা দেখাইয়া বলিল, 'ইনি হতে দিলেন না।'

আমি বলিলাম, 'আমরা সকলেই আশা করেছিলাম তুই আসবি।'

কোন কথা না বলিয়া সে মদের গ্লাসে চুমুক দিতে লাগিল।

আবার বলিলাম, 'এটা আর কতদিন চলবে ?'

বোতল হইতে গেলাসে মদ ঢালিতে ঢালিতে সে বলিল, 'কোনটা ?'

বলিলাম, 'এই মদ খাওয়াটা।'

শান্ত স্বরে সে বলিল, 'আজই শেষ। খেতে ভাল লাগছে না—।'

বলিলাম, 'তাহলে না খেলেই হয়। কিন্তু আজই যে শেষ এ কথাটা বিশ্বাস কর্তে বলিস্ ?'

মাথা নাড়িয়া অনল বলিল, 'উহুঁ না। আমি কিছুই বলি না। তোরা বিশ্বাস করিস আর না করিস তাতে আমার কিছু এসে যাবে না।'

অবাক হইয়া গেলাম। এতদিন অনলকে ভালবাসিয়াছি ; তাহার

সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়াছি। একটা প্রত্যাশা ছিল সেও বুঝি আমায় তেমনি ভালবাসে। কিন্তু যখন সে আমার কথার উত্তরে অসঙ্কোচে বলিয়া বসিল, আমার বিশ্বাস করা না করার উপর সে কোন গুরুত্বই আরোপ করে না, তখন সহসা নিজের মনের মধ্যেই তাহার প্রতি একটা বিরাগ জন্মাইয়া গেল। ছাত্র হিসাবে আমি তাহার চেয়ে অনেক ভাল হইয়াও কেন জানি না তাহার সহিত বন্ধুত্ব করাটাকে যথেষ্ট গর্বের বস্তু বলিয়া মনে করিলাম। হয়ত আমার এই মনোভাবের মূলে কোন সৎযুক্তি নাই। তবুও মনে হয়, কোন কোন মানুষের জীবনে এমন ঘটনা বোধ করি সম্ভব হইয়াছে। না হইলে আমার জীবনেই বা সম্ভব হইল কি করিয়া? সংসারে এমন কয়েকটা মানুষ আছে যাহাদের শতসহস্র ক্রটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও কোন একটা অজ্ঞাত কারণে তাহাদের প্রতি মমতা জন্মাইয়া যায়, এবং নিজের অজ্ঞাতসারেই তাহারা আমাদের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে। তাহাদের সামান্য তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা আমাদের যতখানি আঘাত করে, সাধারণ মানুষের নিদারুণ অবজ্ঞাও ততখানি বেদনাদায়ক নহে। যাহারই জীবনে এমন ঘটনা ঘটিয়াছে সেই বুঝিবে এমন অবস্থায় মনে কতখানি ব্যথা লাগে। একজন যখন অপর একজনকে অকুণ্ঠচিত্তে ভালবাসে, তখন সে ভালবাসার মধ্যে প্রত্যাশার কোন আভাস না থাকিলেও মনের মধ্যে স্বতঃই একটা ধারণা জন্মিয়া যায় যে সেই মানুষটিও বোধ করি তেমনি করিয়া ভালবাসে। আমরা মনে মনে এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তাহার অন্তরের নিকটবর্তী হইতে পারিয়াছি বলিয়া একটা গর্ব অনুভব করি, কিন্তু তাহা যে নাও হইতে পারে, সে কথাটা একবারও ভাবিয়া দেখি না। ভালবাসার প্রতিদানে ভালবাসা লাভ করিবার ইচ্ছাটা সাধারণ মানুষ মাত্রেই থাকে, কিন্তু সহসা যখন সেই মানুষটির সামান্য কথায় ভ্রান্ত ধারণা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, তখন অব্যক্ত বেদনায় অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত গুমরিয়া উঠে। কিন্তু একটু

সুস্থ চিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে, সত্যই ত আমি কাহাকেও ভালবাসিলেই যে প্রতিদানে সেও আমায় ভালবাসিবে এমন কি নিশ্চয়তা আছে? কিন্তু ততখানি চিন্তা করিবার মত শক্তি সাধারণতঃ থাকে না। আমারও ছিল না। তাই কথাটা শুনিবামাত্রই আমার মনে হইল, কথাটা যেন সে আমাকে আঘাত দিবার ইচ্ছা করিয়াই বলিল। একটা অপরিচিত বেদনার দুঃসহ আবেগে মনটা গুমড়াইতে লাগিল। ভাবিলাম, 'সত্যই ত তাহার উপর আমার কি দাবী আছে?' বলাবাহুল্য, এ সবই অভিমানের লক্ষণ। যাহার কাছে মানুষ সবচেয়ে বেশী প্রত্যাশা করে তাহার দেওয়া সামান্যতম আঘাতেই মানুষ বিচলিত হইয়া পড়ে। তাই তাহার সামান্য কথা কয়টিও আমায় সহসা নির্বাক করিয়া দিল।

সেও বোধকরি আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, 'কিরে একেবারে চুপ করে গেলি যে?'

দুর্বলতা প্রকাশ করিবার মত মনোবৃত্তি আমারও ছিল না। বলিলাম, 'কি বলব বল?'

বলিল, 'কিছু একটা বল। আর কিছু না হোক্ উপদেশ দে?'

তাহার কথার মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের আভাস পাইয়া বলিলাম, 'উপদেশ দেবার জন্য ত আসিনি।'

'তবে এলি কেন?'

কি জন্য যে আসিয়াছিলাম তাহা শুধু আমিই জানি। ভাবিয়াছিলাম নমিতার সম্বন্ধে কয়েকটা কথা তাহাকে বলিয়া নিজের মনের গুরুভারের বোঝা কিছুটা লাঘব করিব। এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার সহিত যে প্রবঞ্চনা করিয়াছি তাহা তাহাকে জানাইয়া নিজেকে হাল্কা করিয়া দিব। কিন্তু তাহার ঘরে ঢুকিবার মুহূর্তেই মনের মধ্যে সব কথা যেন উলট পালট হইয়া গিয়াছিল। এখন তাহার প্রশ্নে সেই কথাটাই মনে পড়িয়া গেল, এবং সেই মুহূর্তেই অনলের প্রতি তীব্র ঘৃণার উদ্রেক হইল। ভাবিলাম,

ভালই হইয়াছে যে নমিতা ইহার কাছে তাহার অন্তরের সম্পদ উজাড় করিয়া দেয় নাই। নমিতা আঘাত পাইয়াছে সত্য। কিন্তু যাহাকে সে ভালবাসিয়াছিল সে মানুষটির এতখানি অধঃপতন সে যদি স্বচক্ষে দেখিত অথবা জানিতে পারিত, তাহা হইলে তাহার আঘাত যে কিছুমাত্র কমিত না, উপরন্তু বাড়িয়াই যাইত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই হৃদয়-হীনের কাছে তাহার গোপনতম দৌর্বল্যটুকু প্রকাশ করিয়া প্রত্যাখ্যাত হৃদয়ের বেদনা লইয়া যে তাহাকে ব্যর্থ হইয়া ফিরিতে হয় নাই, ইহাই যথেষ্ট। সে যে কত বড় মারাত্মক ভ্রান্তির হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে সেই কথা চিন্তা করিতেও ভয় হইল। একবার মনে হইল, নমিতা অনলকে স্বচক্ষে এই অবস্থায় দেখিতে পাইলে ভাল হইত। পরক্ষণেই ভাবিলাম, হয়ত সে এই আঘাত সহ্য করিতে পারিত না। হয়ত বা কিছু করিয়া বসিত। নিছক স্নেহের বশবর্তী হইয়া কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত যে অনলের কাছে সব কথা খুলিয়া বলি নাই, এই কথাটা ভাবিয়া মনে মনে আশ্বস্ত হইলাম। নমিতা হয়ত এতক্ষণ ধাবমান রেলগাড়ীর খোলা জানালার পাশে বসিয়া কত কথাই ভাবিয়া চলিয়াছে, কিন্তু সেও বোধ করি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিবে না যে, যাহাকে সে একান্তভাবে ভালবাসিয়াছিল সেই অনল আজ তাহার শয়নকক্ষে বসিয়া নির্লিপ্ত চিত্তে মদের গেলাসে চুমুক দিতেছে।

সহসা অনলের আহ্বানে চেতনা ফিরিয়া পাইলাম।

বলিল, 'আচ্ছা অরুণ, মানুষ মদ খায় কেন জানিস ?'

একটু তিক্তকণ্ঠে বলিলাম, 'কি করে জানব, আমার ত মদ খাবার কোন প্রয়োজন হয়নি।'

বলিল, 'হবেও না। কারণ মদ খাবার মত সাহস তোর নেই।'

বলিলাম, 'সে সাহসে আমার প্রয়োজনও নেই।'

'প্রয়োজন আছে কিনা জানি না। কিন্তু সে সাহস যে তোর কোনদিন হবে না তা আমি জানি।'

তেমনি ভাবেই বলিলাম, 'না হওয়াই মঙ্গল। আগুন নিয়ে খেলা করার মধ্যে সাহস কিছু আছে বলে ত মনে হয় না।'

মুখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া অনল বলিল, 'কিন্তু আগুণ নিয়ে খেলা করার নেশা আছে এক একজনের জানিস ?'

অবজ্ঞা জড়িত কণ্ঠে বলিলাম, 'না—।'

অনল বলিল, 'তুই হয়ত ভাবছিস্, আমি নেশার ঝোঁকে আবোল-তাবোল বকছি—কিন্তু সত্যই আমার কিছুমাত্র নেশা হয়নি।'

কথার জবাব দেওয়া অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হওয়ায় চুপ করিয়া রহিলাম।

সে কিন্তু বলিয়া চলিল, 'আমি জানি তোরা আমার কথা বিশ্বাস করিস্ না, কর্তে পারিস্ না। কিন্তু সত্যই আমার মদ খেতে ভাল লাগছে না; বুক জ্বলছে, গা পাক দিচ্ছে, থেকে থেকে কেমন যেন বিশ্রী লাগছে—তবুও খাচ্ছি—why ?'

বলিলাম, 'এসব কথা আমায় বলে লাভ আছে কিছু ?'

মাথা নাড়িয়া বলিল, 'কিস্সু না—কিস্সু না—বলছি কেবল কিছু বলার নেই বলেই। তুই বসে আছিস সামনে, একটা কিছু ত বলতেই হবে। তাই—'

বাধা দিয়া বলিলাম, 'তাই যদি মনে হয়, তাহলে আমি চলি—'

বল্ল, 'তাই যা, তাই যা, don't stay here, please don't—' বলিতে বলিতে অনল দরজাটা খুলিয়া দিল।

তাহার কথার মধ্যে অসংলগ্নতা লক্ষ্য করিয়া কোন কথা না বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

কিন্তু বাড়ীর বাহিরে আসিয়াই মনে হইল এইভাবে আমার চলিয়া আসাটা যেন ভাল হইল না। কেন যে কথাটা মনে হইল জানি না। এতক্ষণ তাহার সামনে বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার প্রতি যে

বিরাগ সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই বিরাগ সহসা কোথায় মিলাইয়া গেল। নিতান্ত অকারণেই অজ্ঞাত বেদনায় দুই চোখে জল আসিয়া পড়িল। উপরের পানে চাহিতেই দেখি জানালার কাছে একটা ছায়ামূর্তি নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—বুঝিলাম অনল। নিজের মনটাকে প্রাবোধ দিবার জন্য দুই হাতে চোখ দুইটা মুছিয়া লইয়া অস্ফুটে, বলিয়া উঠিলাম, 'কেন যে ছেলেটা এমন কর্ছে কে জানে ?'

মানুষের মন এমনই অদ্ভুত বস্তু যে সামান্যতম আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে তাহার বিশেষ সময় লাগে না, আবার প্রচণ্ডতম আঘাতও সে নিঃশব্দে সহ্য করিয়া যায়। কয়েকমুহূর্ত্ত আগেই অনলের মুখে আমার প্রতি অবজ্ঞার কথা শুনিয়া ভাবিয়াছিলাম যে তাহার প্রতি যেটুকু মমতা ছিল, বুঝি সব নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। এবং স্বচক্ষে তাহাকে মদ খাইতে দেখিয়া মনের মধ্যে যে ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছিল. তাহাকেই স্থায়ী বলিয়া ভাবিয়া নমিতার সহিত তাহার বিচ্ছেদ যে নমিতার পক্ষে মঙ্গলজনক হইয়াছে এই ভাবিয়া একটা হিংস্র আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। এমনকি তাহার আঘাতের প্রতিদানে কিভাবে তাহাকে দ্বিগুণ আঘাত করা যায় তাহাও যে চিন্তা করি নাই এমন নহে। কিন্তু তাহার নিকট হইতে চলিয়া আসিবার পর মুহূর্তেই বুঝিতে পারিলাম যে, ভালবাসার সম্পর্ক অত তুচ্ছ আঘাতে ছিন্ন হইবার নহে। ইহা যে কেমন করিয়া বুঝিয়াছিলাম জানি না, কিন্তু সেই হতভাগাটার জন্য যে এতখানি স্নেহ, এতখানি দৌর্বল্যও আমার মনের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইতে এই কথাটিই সর্বপ্রথমে মনে হইল যে নমিতার সহিত বিবাহ হইলে বোধহয় অনলকে এই অধঃপতনের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিতাম। অনলের এই অধঃপতনের জন্য যে আমিও অনেকাংশে দায়ী, আমার ভীরুতা এবং দ্বিধাজড়িত মনোভাবের জন্যই যে দুইটি সদ্য প্রস্ফুটিত অন্তর মিলিত হইতে পারিল না, এই

ভাবনায় চোখে জল আসিয়া পড়িল। মনে হইল তাহাকে ফাঁকি দিতে গিয়া যেন নিজেই তাহার কাছে পরাজিত হইলাম।

কিন্তু কেন যে এ সমস্ত কথা সেদিন এমনি করিয়া ভাবিয়াছিলাম জানি না। পরবর্তী জীবনে যখন তাহার সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিবার সুযোগ এবং অবকাশ মিলিয়াছে, তখন উপলব্ধি করিয়াছি যে জীবনের রাজপথে সুদীর্ঘ যাত্রার মধ্যে যাহাদের সঙ্গ আমাকে ধন্য করিয়াছিল, নিজের মনের শত সহস্র আশা আকাঙ্ক্ষার অসহায় ব্যর্থতার প্রতিফলন যাহাদের মধ্যে দেখিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে যাহাকে একান্তভাবে আমার আপন বলিয়া মনে হইয়াছিল, যাহাকে সর্ব্বান্তকরণে একান্তভাবে নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম, সে অনল। তাহার সহিত পরিচয়ের প্রথমদিন হইতেই তাহাকে যে কি চোখে দেখিয়াছিলাম জানি না, কিন্তু জীবনের বহুক্ষেত্রে তাহার সহিত বহু মতভেদ হওয়া সত্ত্বেও, কিছুতেই তাহার সাহচর্য্য হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে পারি নাই, বা তাহার চিন্তা মন হইতে মুক্ত করিতে পারি নাই। তাহার সহিত আমার মতের বা মনের শতসহস্র অমিল থাকা সত্ত্বেও সংসারের অধিকাংশ লোক তাহার প্রতি বিনাবিচারে অযথা কঠিন অবিচার করিয়া তাহাকে যেমন অসঙ্কোচে নির্বাসন দিয়াছিল, আমি তাহা পারি নাই। কিন্তু কেন যে পারি নাই, আর কেনই বা সকলের শতসহস্র বিদ্রূপ লাঞ্ছনা এবং তিরস্কার সহ্য করিয়া সেই সর্ববাদি-সম্মত হতভাগ্যটাকে ভালবাসিয়াছিলাম, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলাম যে ব্যবহারিক জীবনে সর্বপ্রকার অমিল থাকা সত্ত্বেও, অন্তরের নিভৃততম তলদেশে আমাদের দুইজনের মধ্যে এমনই একটা সূক্ষ্ম যোগাযোগ ছিল, যাহা চিরদিন সর্বসাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া গেলেও, আমরা কেহই সেই যোগাযোগটাকে অস্বীকার করিতে পারি নাই। অন্ততঃ আমি ত পারি নাই। এবং সেও

যে পারে নাই তাহারও প্রমাণ একদিন আমি নিজেও পাইয়াছিলাম। কি সে যোগাযোগ তাহা ক্ষেত্রান্তরে প্রকাশ করিব। উপস্থিত যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি।

কলেজ খুলিলে চিরাচরিত প্রথামত দুর্বহ পাঠ্যপুস্তকের বোঝা লইয়া ক্লাসের ভালছেলেদের পঙ্‌ক্তিভুক্ত হইবার জন্য যখন সঙ্কুচিত চিত্তে কুণ্ঠিত পদক্ষেপে ক্লাস বসিবার আধঘণ্টা আগে ক্লাসে বসিয়া অনাবশ্যক মনোযোগের সহিত নূতন পুস্তক সমূহের পাতা উল্টাইতেছি তখন অনলের পরিচিত উচ্চকণ্ঠের আহ্বান শুনিলাম, 'কিরে শালা কখন এসেছিস ?'

সাধারণতঃ সে আমায় শ্যালক সম্বোধন করিত না, তাই সহসা তাহার মুখে শ্যালক সম্ভাষণ শুনিয়া প্রত্যুত্তরে কিছু বলিবার পূর্বেই অনল ধূলি ধূসরিত জুতা সুদ্ধ কয়েকখানা বেঞ্চি ডিঙ্গাইয়া আমার সামনে আসিয়া হাজির। প্রচলিতরীতি অনুযায়ী বেঞ্চির উপর দিয়া সহপাঠীর নিকটে আসিবার পথটা সহজ হইলেও স্বাভাবিক নহে; এবং লক্ষ্য করিলাম আশেপাশে উপবিষ্ট অন্যান্য ছাত্ররা কিছুটা তিরস্কারজড়িত বিস্ময়ের সহিত অনলের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। কিন্তু অনল তাহাদের দৃষ্টির প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বসিবার বেঞ্চিতে পা রাখিয়া বই রাখিবার বেঞ্চিটিতে বসিয়া সহাস্য মুখে বলিল, 'আজ ছ'টার শোতে সিনেমা যাবি ?'

তাহার জীবনের সব কিছুরই গতিবেগ যে বেশ কিছু অস্বাভাবিক রকমের দ্রুত তাহা গত কয়েক বৎসরে কিছুটা আন্দাজ করিতে পারিয়াছিলাম। তাই কলেজ খুলিবার প্রথম দিনটিতেই কলেজ জীবনের সহিত পরিচিত হইবার পূর্বে তাহার মুখে অন্য কোন কথা না শুনিয়া সিনেমা যাওয়ার কথাটা শুনিয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য হইলাম না। স্বাভাবিক ধীর স্বরে বলিলাম, 'দেখি যদি সময় পাই।'

বাধা দিয়া সে বলিল, 'সময় পাবি না কি রে? ক্লাশ শেষ হচ্ছে ৩-৪৫; এখান থেকে বাড়ী যেতে কতক্ষণ লাগবে? ধর ২৫ মিনিট—৪-১০; হাতমুখ ধুয়ে খেয়েদেয়ে বেরুতে বেরুতে বড় জোর আর এক ঘণ্টা—৫-১৫। ৪৫ মিনিট সময় থাকবে—enough—enough—যাবিত'? বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই মাথায় একটা চাঁটি মারিয়া অদ্ভুত কৌশলে বেঞ্চির উপর হইতে নামিতে গিয়া একটি ছেলের বইগুলি তাহার পায়ের আঘাতে মাটিতে পড়িয়া গেল। ছেলেটি ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

অনল সপ্রতিভ কণ্ঠে বলিল, 'I am sorry—' বলিয়া বইগুলি তুলিয়া দিল। নূতন ইংরাজী বইখানির মলাট এবং বইটির মধ্যবর্তী কাগজটুকু ছিঁড়িয়া গিয়াছে দেখিয়াও অনল কিছুমাত্র লজ্জিত হইল না। বরং তেমনি হাসিতে হাসিতে বলিল, 'একটু ছিঁড়ে গেছে,—ও কিছু না—আপনারা ত সব ভাল ছেলে—পড়তে পড়তে এক একখানা পাতাই হয়ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলবেন; কি বলুন?'

সে আর বলিবে কি? মনে মনে যে সে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হইয়াছে তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না। তাহার দুইটী কারণ আছে। একটা হইল চক্ষুলজ্জা এবং সঙ্কোচবশতঃ। আর দ্বিতীয়টা ভয়ে। আমাদের মত ভালছেলে সাধারণতঃ ডানপিটে প্রকৃতির ছেলেগুলিকে অল্পবিস্তর ভয় পায়। অনলও বোধ করি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল।

বলিল, 'আপনি রাগ কর্লেন নাকি? তাহলে বলুন একটা নূতন বই কিনে এনে দিই—'

ছেলেটি শশব্যস্তে বলিল, 'না না তার দরকার নেই। ওটুকু ছিঁড়লে আর এমন কি ক্ষতি?'

অনল হাসিয়া বলিল, 'সত্যি বলছেন ত?'

ছেলেটি মাথা নাড়িয়া বলিল, 'মিথ্যা বলার কি প্রয়োজন আছে?'

অনল বলিল, 'বলতেও ত পারেন?'

ছেলেটি সহজভাবেই বলিল, 'অপরের অন্যায়ের প্রতিবাদ কর্ত্তে গিয়ে মিথ্যা বলার কি আছে?'

অনল একটু বিস্মিত হইয়া পলকের জন্য তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, 'বাপরে; আপনিত বড় সোজা লোক নন মশাই?'

ছেলেটি হাসিয়া বলিল, 'বাঁকা কোনখানটায় দেখলেন আমায়?'

অনল নিজের মনেই কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলিল, 'উহুঁ! আপনার নামটি কি বলুন ত?'

ছেলেটি উত্তর দিল, 'কালীধন মুখার্জ্জি।'

অনল সশব্দে হাসিয়া উঠিয়া তাহার নামটা নিজের মনে আবৃত্তি করিয়াই, তাহার স্বাভাবিক বিশ্লেষণী বুদ্ধির সাহায্যে ছেলেটির নামটাকে লইয়া এমন এক অশ্লীল রসিকতা করিল যে, তাহাতে যে কোন ধর্ম্মান্ধ হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসে কঠিন আঘাত লাগা কিছুমাত্র অসম্ভব বা অসঙ্গত নহে। ছেলেটি কিন্তু প্রত্যুত্তরে কোন কথা না বলিয়া হাসিয়া ফেলিল। বুঝিলাম ছেলেটি আর যাহাই হোক্ নেহাৎ নীরস নহে। এবং কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই লক্ষ্য করিলাম অনল এবং তাহার মধ্যে সম্বোধনের ভাষাটা তুমিতে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু আমার সহিত কথাবার্ত্তায় আপনিটাই বজায় আছে।

ইহাও অনলের একটা বৈশিষ্ট্য। সামান্য কয়েক মুহূর্ত্তের আলাপ পরিচয়ের মধ্যেই সে মানুষকে এমন অবলীলাক্রমে আপন করিয়া লয় যে কৃত্রিম সৌজন্য রক্ষা করার কথা মনেই থাকে না। কালীধনের বাহিক গাম্ভীর্য্য এবং আভ্যন্তরীণ অসামান্যতার পরিচয় অতি অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষক এবং ছাত্র মহলে রাষ্ট্র হইয়া গেল। বাংলা এবং ইংরেজী সাহিত্যে তাহার জ্ঞানের পরিমাণ লইয়া ছাত্রদের

মধ্যে রীতিমত জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল, এবং মাসিক পত্রিকার তাহার রচিত 'মানুষের জীবন গঠনে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব' শীর্ষক প্রবন্ধটির মৌলিকত্ব শিক্ষক এবং ছাত্রমহলে যথেষ্ট সাড়া জাগাইয়া তুলিল। আমাদের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপকদের মধ্যে অন্যতম প্রধান এবং তৎকালীন বঙ্গসাহিত্যের যশস্বী সমালোচক। সাধারণতঃ তিনি বিশেষ কাহারও প্রশংসা করেন না। তিনিই যখন একদিন ক্লাশ লইতে আসিয়া কালীধনের লেখা উপরোক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে সমূহ প্রশংসা করিয়া মন্তব্য করিলেন যে চর্চা রাখিলে প্রবন্ধের লেখক ভবিষ্যতে সাহিত্যিক জগতে খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিবে, তখন সকলের সপ্রশংস দৃষ্টির সম্মুখে কালীধন যেন অত্যন্ত কুণ্ঠিত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্লাশ শেষ হইতেই অনল আসিয়া তাহার চিবুক ধরিয়া বলিয়া উঠিল, 'মাইরী বড়দা তোমার পেটে এত কিছু আছে।'

কালীধনের বয়সের তুলনায় তার মুখভাবের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য এবং তাহার গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা লক্ষ্য করিয়া অনলই তাহার নাম দিয়াছিল 'বড়দা'। মানুষের আকৃতি প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নামকরণ করিতে অনল সিদ্ধহস্ত। এবং অনলের মুখে 'বড়দা' সম্ভাষণ শুনিয়া কালীধন অধিকতর লজ্জিত হইয়া বলিল, 'ছাড়্ ছাড়্। ফাজলামি করিস্ না। চল্ চা খেয়ে আসি।'

অনল এবং কালীধনের মধ্যে আমার উপস্থিতি নেহাৎ-ই অনুল্লেখযোগ্য। এবং কি করিয়া যে কালীধনের সহিত পরিচয় হইয়াছিল তাহাও সঠিক মনে নাই। তবে যেটুকু মনে আছে তাহাতে বুঝিতে পারি আমার এবং কালীধনের পরিচয়ের মূলে অনলের কৃতিত্বই ছিল বেশী। বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী সহধর্মী চুম্বক পরস্পরকে আকর্ষণ ত করেই না বরং দূরে সরাইয়া দেয়। আমি এবং কালীধন ছিলাম

সহধর্মী মানুষ। তাই আমাদের মধ্যে বিকর্ষণটা স্বাভাবিক হওয়া সত্ত্বেও যে অসদ্ভাব নাই তাহার জন্য অনলের কাছেই আমরা ঋণী। বেশী কথাবার্তা বলা আমাদের দুজনেরই স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু অনলের উপস্থিতি আমাদের স্বভাবধর্মের সকল বিধিনিষেধ চূর্ণ করিয়া কয়েক মুহূর্তের জন্য আমাদেরও সহজ সাবলীল করিয়া দিত। অনলের অনুপস্থিতিতে আমরা দুইজনে চুপচাপ বসিয়া থাকিতাম। বলিবার কথা প্রচুর থাকিলেও বলিবার উৎসাহ এবং আগ্রহটুকু যেন কোথায় আত্মগোপণ করিয়া থাকিত, এবং অনলের আবির্ভাব যেন চকিতে আমাদের দুইজনের অন্তর স্পর্শ করিয়া আমাদের নিদ্রিত মনে চেতনা জাগাইয়া তুলিত। ইহাও অনলের চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আমরা বয়সে নবীন হইলেও আমাদের অন্তরের মধ্যে যে অকালবার্দ্ধক্যের স্পষ্ট চিহ্ন ছিল তাহা আমরা দুইজনেই উপলব্ধি করিতাম। সাধারণ বাঙালী ছেলের মত কোন কাজেই তাড়াহুড়া করার শক্তিও ছিল না এবং তাড়াহুড়া করা পছন্দও করিতাম না। কিন্তু অনল অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে হাল্কা হাসি তামাসার মধ্য দিয়া আমাদের দুইজনের অলস চিত্ত মথিত করিয়া এমনই সজীব করিয়া তুলিত যে সময়ে সময়ে নিজেদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছি। তাহার চঞ্চল পরিবেশের মধ্যে পড়িয়া সময়বিশেষে আমরাও কিছুটা আবেগ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছি। এবং অনলের বন্ধনমুক্ত প্রাণপ্রবাহের সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের মনও সময়ে সময়ে ভাসিয়া গিয়াছে। তাই অনলের উপস্থিতি অপেক্ষা অনুপস্থিতিটাই আমরা বেশী অনুভব করিতাম।

একদিন অনলের অনুপস্থিতিতে এই কথাটা লইয়াই দুইজনে চায়ের দোকানে বসিয়া আলোচনা করিতেছিলাম। অনলের সহিত প্রথম পরিচয়ের সূত্র ধরিয়া আজপর্যন্ত যতকিছু ঘটিয়াছে তাহারই একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়া মন্তব্য করিলাম, 'ছেলেটা সময়ে সময়ে এমন দুর্বোধ্য হয়ে

উঠে যে সে সময়ে তাকে বোঝার চেষ্টা করাও ভুল।' অনলের সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অনেক কথাই বলিলাম বটে, কিন্তু নমিতার প্রসঙ্গটা ইচ্ছাপূর্বক বাদ দিয়া গিয়াছিলাম।

কালীধন নীরবে সব শুনিয়া বলিল, 'অনলকে প্রথমদিনেই লক্ষ্য করেছিলাম। তার কথাবার্তার মধ্যে বিদ্রূপ আছে বটে, কিন্তু সেটা নিছক বিদ্রূপই নয়।'

বুঝিলাম কালীধন কলেজ জীবনের প্রথম দিনটির কথা বলিতেছে। বলিল, 'ছেলেটার সারল্য দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।'

বলিলাম, 'আপনি হয়ত একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন অনলের কথা শুনে—।' ঘাড় নাড়িয়া কালীধন বলিল, 'না। সে যে বাঁধাধরা ভদ্রতার ধার ধারে না, এইটা লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়েছিলাম।'

এই সময়ে কথাপ্রসঙ্গে কালীধন অনলের সম্বন্ধে এমন কতকগুলি মন্তব্য করিল যাহা শুনিয়া নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিলাম অনলকে সে অত্যন্ত গভীর ভাবেই লক্ষ্য করিয়াছে; এবং দীর্ঘ পরিচয়ের মধ্যে অনলকে আমি যতটা বুঝিয়াছি তাহার অপেক্ষা অনলকে সে আরও নিবিড়ভাবে বুঝিতে পারিয়াছে। শুধু তাহাই নহে অনলযে কালীধনের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছে তাহাও তাহার কথাবার্তায় স্পষ্ট প্রকাশ পাইল। এবং সর্বশেষে সে বলিল, 'আমার মনে হয় অনলের জীবন গঠনের উপাদান গুলির পরস্পরের মধ্যে ঠিক সামঞ্জস্য ছিল না। তাই তার জীবনযাত্রার প্রণালীটাও একটু অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

মন্তব্যগুলি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। এইভাবে অনলের সম্বন্ধে কোনদিন চিন্তা করি নাই।

কালীধনের মুখে অনলের মনোবৃত্তির ব্যাখ্যা শুনিয়া কৌতুহল সংবরণ করিতে পারিলাম না। বলিলাম, 'কিন্তু এই অস্বাভাবিকত্বটুকু স্থায়ী নাও হতে পারে ত? হয়ত ভবিষ্যৎ জীবনে কোন ঘটনা বা ব্যক্তি-

বিশেষকে কেন্দ্র কৃরে তার স্বাভাবিকত্বটুকু আবার ফিরেও আসতে পারে।'

কালীধন বলিল, 'বোধ হয় তা সম্ভব হবে না। অনলের মত ছেলেগুলোর দেখা সংসারে সচরাচর পাওয়া যায় না। কিন্তু একটু লক্ষ্য কর্লেই দেখা যায় সংসারে যতকিছু পরিবর্তন ঘটেছে তার অধিকাংশই ঘটিয়েছে অনলের মত মানুষেরা।'

বিস্মিত কণ্ঠে বলিলাম, 'কিরকম?'

বলিল, 'এদের বুদ্ধি আর ভাবাবেগ বস্তুটা এত বেশী পরিমাণে থাকে যে, যা কিছু করুক না কেন শেষ পর্যন্ত না দেখে ছাড়বে না। শুধু তাই নয়, সাধারণতঃ যে সব জিনিষ গুলোর প্রতি আমরা নজর দিই না বা নজর দেবার মত সাহস থাকেনা, এই মানুষগুলো সেই সব জিনিষগুলো নিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব কর্তে চায়। কিন্তু মুস্কিল হল এই যে এদের জীবনের বিস্তৃতি এত বেশী যে এরা সময়ে সময়ে নিজেরাও আত্মবিস্মৃত হয়ে যায়। এই সময়টাই এদের জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। কারণ মানুষ হিসেবে এরা কারুর চেয়ে কম নয়। এটা তারা নিজেরাও বুঝতে পারে, ফলে অহঙ্কার এসে বাসা বাঁধে তাদের মনে। এবং এই অহংকার এতই শক্তিশালী যে জীবনের কোন ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই এদের মাথা নিচু কর্তে দেয়না। তাই জীবনের দুঃসময়ে এরা কারুর কাছেই আশ্রয় চাইতে পারে না। কারণ আশ্রয় চাওয়া মানেই নিজেকে কিছুটা ছোট করা, এবং প্রাণ গেলেও এরা তা কর্বেনা। জীবনটা এদের কাছে একটা পরিহাস মাত্র;—সেটা থাকাও যা না থাকাও তাই। এই জীবনটাকে রাখার জন্য আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ কর্তে চায় না এরা—এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ এ মানুষগুলো অস্বাভাবিক কিছু একটা কর্বেই। ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্। কিন্তু স্বাভাবিক জীবন যাপন করা এদের পক্ষে অসম্ভব।'

নির্বাক বিস্ময়ে কালীধনের কথাগুলি শুনিয়া যাইতেছিলাম। অনলকে ভালবাসিয়াছিলাম সে কথা সত্য। এবং তাহার বহু আচার আচরণ বহু কথাবার্তা অনেক সময় সঠিক বুঝিতে পারি নাই। নিজের স্বল্পবুদ্ধির পরিমাণে যেটুকু বুঝিয়াছিলাম সেইটুকু লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলাম। যেখানে তাহাকে জটিল বলিয়া মনে হইয়াছে সেখানে তাহাকে জটিলই থাকিতে দিয়াছি, সহজ করিয়া দেখিবার বা বুঝিবার চেষ্টাও করি নাই। সেই শক্তিও ছিল না। কিন্তু কালীধনের মুখে অনলের সম্বন্ধে কথাগুলি শুনিয়া অনলের সম্বন্ধে যতখানি বিস্মিত হইলাম, তাহা অপেক্ষা বেশী শ্রদ্ধা হইল কালীধনের উপর, তাহার অন্তর্দৃষ্টির গভীরতার পরিচয় পাইয়া। একবার ভাবিলাম আরও কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া অনলের সম্বন্ধে নিজের মনে যে সমস্ত অমিমাংশিত সমস্যাগুলি আছে তাহার সমাধান করিয়া লই। পরক্ষণেই ভাবিলাম না, তাহা হইলে অনলের সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইবে। বিশেষ করিয়া শেষের চিন্তাটার জন্যই অনলের সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করিতে সাহস হইল না। কিন্তু ইহা ছাড়াও আর যেসব কারণে অনলের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করিয়াই চুপ করিয়া গেলাম সেইসব কারণগুলি নিতান্তই ব্যক্তিগত। অতএব তাহা আর বলিলাম না।

অনল শব্দের অর্থ আগুণ। আগুণ জ্বালাইলেই তাহার উত্তাপ মানুষকে তাহার দাহশক্তির সম্বন্ধে সর্বদাই সজাগ করিয়া দেয়। অনলও তেমনি করিয়া তাহার পারিপার্শ্বিকতাকে আপনার প্রাণস্পর্শে সচেতন করিয়া তুলিত অতি অল্পসময়ের মধ্যেই। তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর যেমন সংসারের আরও বহু মানুষকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল—তেমনি ক্লাসের অন্যান্য ছেলেরাও ধীরে ধীরে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল তাহার এই সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের জন্য। একদিন দেখিলাম ক্লাসের অখ্যাত ছেলেপুলের মধ্যে বসিয়া অত্যন্ত দরদের সহিত বেঞ্চি বাজাইয়া অনল কণ্ঠসঙ্গীত সুরু

করিয়া দিয়াছে। বলা বাহুল্য তাহার কয়েকটি গানের ভাষা সময়ে সময়ে অশ্লীলতার মাত্রা ছড়াইয়া যাইত। কিন্তু তবুও সকলে তাহাকে ভালবাসিত। তথাকথিত ভালছেলেরাও নিকটবর্তী বেঞ্চগুলায় বসিয়া ইচ্ছামত বই খুলিয়া গান না শুনিবার ভান করিয়া গান শুনিত ; আবার সময় বিশেষে একখানির জায়গায় দুইখানি গান করিবারও অনুরোধ করিত। প্রায় সকলের সহিতই তাহার পরিচয় ছিল। ফার্ষ্ট ইয়ার হইতে ফোর্থ ইয়ার পর্যন্ত সব ক্লাসের ছেলেদের সহিতই তাহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যাইত। কিন্তু সুযোগ পাইলেই সে চলিয়া আসিত আমার এবং কালীধনের কাছে।

বলিত, 'চল বড়দা, বাজে কথা বলে মুখ শুকিয়ে গেছে—একটু চা খেয়ে আসি।'

কলেজের সকলেই জানিত অনল সকলের সহিতই অন্তরঙ্গতা করে সকলেরই প্রিয়পাত্র সে। এমনকি নারীদের সহিত অনলের পরিচয় বা নারীমহলে অনলের অবাধ গতিবিধির সংবাদও সকলে জানিত। কারণ অনলের কাছে ইহা গোপনীয় কিছু নহে। কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যে সমস্ত নারীর চিত্ত সে স্বেচ্ছায় হোক্ বা অনিচ্ছায় হোক তাহার আলোকসামান্য মোহিনীশক্তির দ্বারা জয় করিয়াছিল, ইহাদের ইতিহাস খুব কম মানুষই জানিত। তাহাদের কথা, তাহাদের পরিচয় এমন অদ্ভুত উপায়ে অনল গোপন করিয়া রাখিত যে মাঝে মাঝে বিস্মিত হইয়া ভাবিতাম ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়? নারীর সম্বন্ধে অনলের মনোভাব জানিতে আমার অথবা কালীধনের বাকী ছিল না। কালীধন কি ভাবিত ঠিক জানি না। কিন্তু আমি কিছুতেই অনলের এই মনোবৃত্তি সমর্থন করিতে পারিতাম না। অগ্নি যেমন করিয়া পতঙ্গকে আকর্ষণ করে, ঠিক তেমনি করিয়া কত নারীর হৃদয় যে অনল আকর্ষণ করিয়াছিল তাহার ঠিক নাই। অনলের চরিত্রের এই

বৈশিষ্ট্যটুকুকে কোনদিন ভাল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি নাই। কেন জানি না। হয়ত আমার যুগযুগান্তরের সংস্কার। হয়ত বা অন্যকোন কারণও ছিল। অনলের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে পরিহাসচ্ছলে সেই সব নারীর সম্বন্ধে অনলের নানাপ্রকার ইঙ্গিত এবং আলোচনা শুনিয়া মনের মধ্যে অস্বস্তি অনুভব করিতাম। মনে হইত ছেলেটা এই একটি বস্তুর জন্যই সংসারে সব হারাইবে। সেই সঙ্গে সেইসব অজানিতা নারীদের কথা ভাবিয়া দুঃখ হইত—নমিতার কথা মনে পড়িয়া যাইত।

প্রথম প্রথম অনলকে নানাভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। ভাবিয়াছি সে বুঝি ইচ্ছা করিয়াই মেয়েদের লইয়া খেলা করিত। নারীর প্রতি তাহার গভীর বিতৃষ্ণা এবং অবজ্ঞার কথা আমার অজ্ঞাত ছিল না। তাই মাঝে মাঝে তাহাকে বলিতাম, 'আচ্ছা অনল মেয়েদের তুই ভালবাসিস্।'

সপ্রতিভ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিত, 'না।'

'তবে তাদের নিয়ে এমন খেলা করিস কেন?'

প্রত্যুত্তরে হাসিয়া বলিত, 'তারা যে তাই চায়।'

উত্তেজিত হইয়া বলিতাম, 'না, কক্ষনও নয়।'

মৃদু হাসিয়া সে বলিত, 'তবে কি চায়?'

তাহার একথার জবাব দিতে পারিতাম না। কারণ প্রথমেই বলিয়াছি নারীদের সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। কি যে তাহারা চায় তা' আর কি যে তাহারা চায় না এ সকল তথ্য আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। পারিবারিক জীবনের বাহিরে কোন নারীর সহিত পরিচিত হইবার মত সৌভাগ্য আমার হয় নাই। অতএব নারী সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আত্মীয় পরিজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই অনলের মুখে নারীদের সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া প্রতিবাদ করিবার মত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবাদের ভাষা খুঁজিয়া পাইতাম না।

অনলও বোধ হয় আমার দৌর্বল্য বুঝিতে পারিয়া বলিত, 'বলনা মেয়েরা কি চায়? কবিতা? গান? চাঁদের আলো?'

তাহার কঠিন বিদ্রূপাত্মক কথাবার্তা নীরবে সহ্য করিয়া যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, কিন্তু কোনদিনই তাহার এইসব দাম্ভিক উক্তিগুলিকে নিঃসংশয়ে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারি নাই। কেবলই মনে হইত নারীর প্রকৃত রূপ আজও অনল দেখিতে পায় নাই। অথচ কথাটা মনে হইত এইমাত্র। অনলও আমার নীরবতা লইয়া অনেক বিদ্রূপ করিত।

কিন্তু একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়া ফেলিলাম, 'মেয়েদের সম্বন্ধে তোর ভুল একদিন ভেঙ্গে যাবে অনল?'

শ্লেষাত্মক হাসি হাসিয়া অনল বলিল, 'কি রকম?'

বলিলাম, 'যে মেয়েদের নিয়ে তুই খেলা কর্চ্ছিস্ তারাই সব নয়। মেয়েদের আরও একটা রূপ আছে যা আজও তোর চোখে পড়েনি।'

তেমনি হাসিমুখে অনল বলিত, 'সেটা আবার কোন রূপ? রাজ্যেশ্বরী মূর্ত্তি না ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি?'

বিরক্ত হইয়া বলিতাম, 'দেখবি একদিন—তখন আফশোষ কর্তে হবে।'

কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কপালে করাঘাত করিয়া সে বলিত, 'নেহাৎই যদি তেমন দিন কোনদিন আসে তখন না হয় আফশোষ করা যাবে।'

কথাটা বলিয়াই সে হাসিয়া ফেলিত। বলিত, 'তুই কিন্তু ঠক্‌বি অরুণ। মেয়েরা যদি জানতে পারে মেয়েদের প্রতি তোর এই দুর্বলতার কথা, তাহলে আর তোর রক্ষা নেই,—তোকে ছিড়ে খেয়ে ফেলবে।'

তাহার কথার জবাব দেওয়ার কোন প্রয়োজন না দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিতাম।

পরক্ষণেই কণ্ঠস্বরের অদ্ভুত পরিবর্তন করিয়া সে বলিত, 'তোরা আমায় বড় ভুল বুঝিস্ অরুণ? আমি সত্যই ইচ্ছে করে মেয়েদের কাছে যাই না, বরং যতক্ষণ উপায় থাকে ততক্ষণ তাদের কাছ থেকে দূরে দূরেই থাকতে চাই। থাকিও তাই। কিন্তু সব সময় তা সম্ভব হয় না এবং একটু কাছে গেলেই—ব্যস্ আর নিস্তার নেই।'

কথাগুলি বিশ্বাস করিবার মত নহে। সহসা বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তিও হইত না। কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরের মধ্যে এমন একটা বিশিষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করিতাম যে শেষের কথাগুলিকে আগাগোড়া মিথ্যা বলিয়া অবিশ্বাস করিবার মত মনের জোর পাইতাম না। তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতাম বলিয়া নির্বিচারে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিতে না পারিলেও বিনাবিচারে নির্দোষীও প্রতিপন্ন করিতে পারি নাই।

আজ সে আমাদের মধ্যে নাই, এবং সে আজ আমাদের সকল সমালোচনার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। তাই আজ তাহার কথা মনে পড়িলে সর্বাগ্রে যে কথাটি মনে হয়, তাহা হইতেছে তাহার বলা কথাগুলির অন্তর্নিহিত গুরুত্ব এবং সত্যতা। আজ বেদনাবিধুর স্মৃতি-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চোখের জলের মধ্যে মনে করি তাহার সরল সুন্দর নিষ্পাপ মুখশ্রী, সে মুখে প্রবঞ্চনার চিহ্ন মাত্রও ছিল না। আজ নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করি যে সে সত্যই মিথ্যা বলে নাই। যে সমস্ত নারীর কথা আমি জানি, তাহাদের প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে নিজের জীবনটাকে জড়িত করিবার জন্য কোন মিথ্যা, কোন ছলনার আশ্রয়ই সে লয় নাই। কালীধন ঠিকই বলিত তাহার নামের একটা সার্থকতা ছিল। পতঙ্গকে আকর্ষণ করাই আগুনের ধর্ম। তাহার জন্য কেবল আগুণকে দোষ দেওয়া যায় না, তেমনি অনলের জীবনের সহিত জড়িত বহুনারীর ব্যর্থ হৃদয়দানের অশ্রুশিক্ত ইতিহাসের জন্য অনলকেও দায়ী করা চলে না।

কিন্তু একথা আমিও সব সময় বুঝিতাম না। তাই সময় বিশেষে সে হতভাগ্য আমার কাছেও সুবিচার পায় নাই। তাহার জন্ম দোষ আমার বা আমাদের। সে অকুণ্ঠচিত্তে নিজের দুর্দান্ত গতিবেগের কথা সর্বসমক্ষে প্রচার করিয়া নিজের জীবনটাকে লইয়া হাসিমুখে একটা বিরাট পরিহাস করিয়া গেল। মুহূর্তের জন্যও তাহাকে ইতঃস্ততঃ করিতে দেখি নাই। এবং নিজের জীবন লইয়া এই নির্মম পরিহাসের জন্য যদিও বা সংসারে কাহারও কোন ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য দোষ অনলের নহে; তাহার জন্য দোষী সে, যে অনলকে বুঝিয়াই হোক্ অথবা না বুঝিয়াই হোক্ ভালবাসিয়াছিল। কেন কথাগুলি বলিলাম তাহাই বলি।

ফার্ষ্ট ইয়ারের মাঝামাঝি। হঠাৎ কয়েকদিনের জন্য অনল কলেজ কামাই করিল। দিনদুই পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় তাহার সন্ধানে তাহাদের বাড়ীতে গিয়া শুনিলাম কলিকাতা হইতে কিছু দূরে সে এক বিবাহে বরযাত্রী গিয়াছে। ফিরিয়া আসিবার সময় যথাকালে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে কিন্তু অনলের খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। চিন্তিত মুখে বাড়ী চলিয়া আসিলাম। আরও দুইটা দিন কাটিয়া গেল। একদিন কলেজের অবসর সময়ে চায়ের দোকানে আমাদের পরিচিত স্থানটি দখল করিয়া আমি আর কালীধন অনলের অনুপস্থিতিতে সবিশেষ চিন্তিত হইয়া তাহার গন্তব্য স্থানসমূহ সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করিতেছি, এমন সময় মূর্তিমান বিভীষিকার মত অনল আসিয়া হাজির। মাথার চুলগুলা তৈলের অভাবে রুক্ষ এবং যত্নের অভাবে অবিন্যস্ত, পোষাক পরিচ্ছদ ধূলিমলিন, চোখেমুখে গভীর ক্লান্তির ছাপ।

বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, 'কিরে কি ব্যাপার? হঠাৎ কোথায় ডুব মারলে বলত?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলিল, 'বলছি সব। একটু চা দিতে বল। পকেটে একটাও পয়সা নেই।'

রহস্য করিয়া বলিলাম, 'মহাদেবের দারিদ্র্য ?'

প্রত্যুত্তরে অনল একটু হাসিল মাত্র। কিন্তু সে হাসিতে যেন তাহার স্বাভাবিক মাধুর্য নাই বলিয়া মনে হইল। কেমন যেন প্রাণহীণ হাসি। বেয়ারা চা দিয়া গেল। অত্যুষ্ণ চায়ের কাপে স্বচ্ছন্দে একটা চুমুক মারিয়া গভীর পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'আঁঃ বাঁচালি মাইরি।'

বলিলাম, 'তাত বুঝলাম, এখন কি ব্যাপার খুলে বল ত ?'

বল্ল, 'এইখানে বসে শুনবি না অন্তরালে যাবি ?'

মনে মনে আন্দাজ করিয়া লইলাম কোথায় কিছু একটা সে করিয়া আসিয়াছে। আমি কিছু প্রশ্ন করিবার পূর্বেই কালীধন বলিল, 'অন্তরালে যাবার প্রয়োজন কি, এইখানেই বল, আমি না হয় চলে যাচ্ছি।' বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অনল তৎক্ষণাৎ তাহার একটা হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, 'পাগল নাকি ? তুমি কোথায় যাবে ? তোমাকেই বিশেষ দরকার—কিন্তু এরা—' বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আশে পাশে উপবিষ্ট অপরিচিত খরিদ্দারদের দেখাইয়া দিল।

কালীধন বলিল, 'ওদের জন্য কিছু আটকাবে না। তুমি নির্ভয়ে বল।'

অনল খুব সহজভাবেই বলিল, 'কিন্তু ব্যাপারটা একটু শ্রুতিকটু—মানে—।' কথাটা অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়া বামচক্ষু মুদ্রিত করিয়া একটা পরিচিত ভঙ্গী করিল। তাহা দেখিয়া আমরা দুজনেই হাসিয়া ফেলিলাম।

কালীধন বলিল, 'হোক্ শ্রুতিকটু, তুমি ত কিছু অন্যায় করনি ?'

কালীধনের কথা শেষ হইতে না হইতেই অনল বলিয়া উঠিল, 'আগে থেকে অতটা **Complement** দিওনা বড়দা। শুনলে তুমিও ঘেন্নায় নাক সিঁটকাবে।'

কালীধন এক মুহূর্ত্ত কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলিল, 'তোমায় ঘেন্না করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।'

কলহাস্য করিয়া অনল বলিল, 'সম্ভব নয় ?'

কালীধন বলিল, 'কক্ষণও নয়। এখন বলত !'

'বহুৎ আচ্ছা। তবে শোন—গিয়েছিলাম একটা বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্তে। জায়গাটা কলকাতা থেকে কিছু দূরে। রেলষ্টেশনে নেমে মাইল ১০ রাস্তা যেতে হয়? গরুর গাড়ী অথবা পদব্রজে। বরযাত্রী হিসাবে—আমরা জন ৪০।৪২, তাদের মধ্যে আমিই ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ। সহরের লোক বলে শ্রীচরণে ভরসা কর্তে সাহস হলনা। গরুর গাড়ীতেই রওনা হলাম। বরযাত্রীর সংখ্যা কত হবে আন্দাজ কর্তে না পেরে, কন্যাপক্ষ গরুর গাড়ীর যে আয়োজন করেছিলেন, তাতে একজন বরযাত্রীর ২খানা করে গাড়ী ব্যবহার করা চলতে পার্ত। কিন্তু বরযাত্রীদের মধ্যে সে রকম ইচ্ছে না থাকায় যে যার নিজের পছন্দমত সঙ্গী বেছে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। আমার প্রতি নজর দেবার মত সময় কারুর ছিল না। এবং সেই অসংখ্য গরুর গাড়ীর মধ্যে সামান্য বরযাত্রীর দলটাকে খুঁজে বার করার মত শক্তিও আমার ছিল না।'

মন্তব্যটা শুনিয়া আমরা তুইজনেই হাসিয়া ফেলিলাম।

অনল নির্বিকারভাবে বলিয়া যাইতে লাগিল, 'সবাই চলে যাওয়ার পর একখানি গরুর গাড়ীতে একটি নাবালক গাড়োয়ানকে নিয়ে রওনা হলাম আমি। গাড়োয়ানটাকে নাবালক বল্লাম এইজন্যে যে তার বয়স আমার চেয়েও কম। রওনা ত হলাম। কিন্তু কিছুদূর যাবার পর গাড়োয়ানটা আমায় আবেদন জানাল যে সকালবেলায় খাওয়াদাওয়ার কিছু গণ্ডগোল ঘটায় তার পেটের অবস্থা নেহাৎ ভাল নয়—অতএব কিছুক্ষণের জন্য ছুটি চায়। উদারভাবে হুকুম দিলাম, 'যা।' ছোঁড়া চলে গেল। কিন্তু সেই যে গেল আর আসে না। প্রায় আধঘন্টা

চুপচাপ বসে বসে নির্জলা মশার কামড় খেলাম। ব্যাটা তবুও ফিরে না। আরও মিনিট পনের কাটবার পর ফিরে এল। আবার সুরু হল চলা, তৈলতৃষিত চাকার আধিভৌতিক আওয়াজ আর মশার ডাক— বড় রোমান্টিক বুঝলি অরুণ।'

আমি কিছু বলিবার পূর্বেই কালীধন বলিল, 'Romanceএর সুরু হয়নি এখনও এটা শুধু Preface.'

পলকের জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কালীধনের মুখের পানে চাহিয়া লইয়া অনল বলিল, 'সাধে কি আর তোমায় বড়দা বলি—যাই হোক গরুদুটোর চলার ভঙ্গী দেখে গাড়োয়ানটাকে বল্লাম, 'তোর গরুদুটো কি স্কুলের মাষ্টারী করে নাকি?' ব্যাটা কি বুঝল জানি না। বল্ল, 'হুঁ।'

স্কুল মাষ্টারের সম্বন্ধে নির্দয় মন্তব্যে আমি হাসিয়া ফেলিলাম কিন্তু কালীধন তেমনি একাগ্র দৃষ্টিতে অনলের পানে চাহিয়া রহিল।

অনল বলিয়া চলিল, 'বল্লাম কিরে ব্যাটা তোর গরু জোরে চলেনা কেন?'

ছেলেটা জানাল যে গরুদুটো গাড়ী টানার কাজ করে না, হালচাষ করে এবং সে দুটো আদৌ গরু নয় বলদ। এবং সবশেষে জানাল যে এরচেয়ে তাড়াতাড়ি যেতে হলে পায়ে হেটে যেতে হবে। ছেলেটার আর যাই থাক্ চক্ষুলজ্জা নেই। আমি আর কিছু না বলে শুয়ে পড়লাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। হঠাৎ গাড়োয়ানটার ডাক শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। বল্লাম, 'কিরে পৌছে গেছি?'

গাড়োয়ানটা বল্ল, 'আজ্ঞে না।'

বল্লাম, 'তবে ডাকলি কেন; বেশ ত ঘুমুচ্ছিলাম।'

গাড়োয়ানটা কোন ভণিতা না করে প্রশ্ন কর্ল, 'আপনি রাস্তা চেনেন?'

ভাবলাম ব্যাটা বলে কি? কথাটা যে রহস্য করে বলেনি তা বুঝতে পার্লাম।

বল্লাম, 'তুই রাস্তা চিনিস্ না নাকি ?'

সে অম্লান বদনে মাথাটা নেড়ে জবাব দিল, 'না।'

একবার মনে হল ধরে মারি ব্যাটাকে। তারপর ভাবলাম তাতে কোন লাভ হবে। বল্লাম, 'সোজা রাস্তায় গেলে পৌছান যাবে না ?'

সে তেমনি ভাবেই বলিল, 'আজ্ঞে না।'

বল্লাম, 'তুই এর আগে কখনও ষ্টেশনে আসিস্নি ?'

তার উত্তরে সে বেশ্ জোরের সঙ্গেই জানাল যে এই সে প্রথম রেলষ্টেশন দেখল জীবনে। কি বলব ভাই তখন রাগও হয়েছে—হাসিও পাচ্ছে—বল্লাম 'রাস্তা ভুল কর্লি কি করে ?'

তার উত্তরে সে বল্ল সেও ঘুমিয়ে পড়েছিল। এবং ঘুম ভাঙ্গার পরই সে আমায় ডেকে তুলেছে। বুঝলাম কোন উপায়ই নেই। রাত্রি তখন দশটা বেজে গেছে।

বল্লাম, 'তবে তুই থাক গাড়ীতে আমি দেখে আসি আগে কোন গ্রামট্রাম আছে কিনা ?'

ব্যাটা কেঁদে আমার পা জড়িয়ে ধরে বল্ল, 'এতরাত্রে যদি এই জঙ্গলের মধ্যে তাকে একা ফেলে যাই, তাহলে ভূত আর তাকে আস্ত রাখবে না। নিরুপায় হয়ে বল্লাম, 'তাহলে গাড়ীটা নিয়েই চল। আলোয় গিয়ে দেখি যদি কোন উপায় হয়।'

আরও ঘণ্টাখানেক যাবার পর একটা গ্রামে ঢুকলাম। একে ত রাত্রি এগারটা বেজে গেছে, তার উপর পাড়াগাঁ; রাস্তার কুকুরগুলো চিৎকার সুরু করে দিল। রাস্তার পাশেই একটা বাড়ীর লোককে ডাকাডাকি করেও তুললাম। সে আবার ভেতর থেকেই জিজ্ঞাসা কর্ল 'কে ?'

ভাবলাম কি উত্তর দিই, যদি সঠিক উত্তর দিই তাহলে প্রশ্ন বাড়বে বই কমবে না। তাই রহস্য করে বল্লাম, 'মানুষ।'

ভেতর থেকে জবাব এল, 'তাত বুঝতে পাচ্ছি। তুমি আমার সম্বন্ধী নও। কি নাম?'

নাম বল্লাম। লোকটা কানে কম শোনে কি না জানি না। বলিল, 'অনিল মুখুজ্যে? মুখুজ্যে ত এ বাড়ীতে কেন? এটাত ঘোষের বাড়ী।'

বিরক্ত হয়ে বল্লাম, 'তা ঘোষ কি বোস সেটা ত আর গলার স্বরে বোঝা যায় না। একবার বাইরে আসুন না দয়া করে।'

ভেতর থেকে জবাব এল, আসছি বাইরে। 'বলেই ব্যাটা চিৎকার সুরু কর্লে, 'চোর চোর! ওরে নেদো, পটলা শিগ্‌গীর্ ওঠ, চোর পড়েছে।'

অনলের কথায় বাধা দিয়া বলিলাম, 'prefeceটা কিন্তু বড্ড বড় হয়ে যাচ্ছে অনল?'

মৃদু হেসে সে বল্ল, 'শোন্ না সবটা।' সে ব্যাটার চিৎকার শুনে পাড়ার আশেপাশের বাড়ীগুলো থেকেও সোরগোল উঠল, 'চোর, চোর।' দেখলাম শালা ভারী বিপদ ত। তখন পালাবার ও কোন উপায় নেই। চারধার থেকে লণ্ঠন আর লাঠি নিয়ে কম করে জন পঞ্চাশ লোক বেরিয়ে পড়েছে। 'নিরীহ গ্রামবাসী', কথাটা যে কত মিথ্যা তার জলন্ত প্রমাণ পেলাম সেদিন। সবাই মিলে ত ঘিরে ধর্ল আমায়। সবাই বলছে, 'মার শালাকে, ধর্ শালাকে।' বেগতিক দেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

কয়েকজন একটু এগিয়ে এসে লণ্ঠনটা মুখের সামনে ধরে বল্ল, 'দেখে ত ভদ্রলোক বলে মনে হয়—' পিছন থেকে কে একজন বল্ল, 'ঐরকমই মনে হয়—ব্যাটা ভোল বদলেছে—'

একজন মাঝবয়সী লোক সাহস করে জিজ্ঞাসা কর্ল, 'তোমার নাম।' নামটা বল্লাম। লোকটা ভ্রূ কুঁচকে বল্ল, 'অনল? অনল আবার কি নাম?'

নামের অর্থ যে কোনদিন কাউকে বোঝাতে হবে তা কখনও ভাবিনি। বল্লাম, 'অনল মানে আগুন।'

লোকটা যেন চম্‌কে উঠল। বল্ল, 'আগুন?'

একজন কে টিপ্পনী কাটল, 'হ্যাঁ, টিকের আগুন।'

যে লোকটা সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল সে জিজ্ঞাসা কর্ল, 'কোথা থেকে আসা হচ্ছে?'

বল্লাম, 'কোলকাতা থেকে।'

'এখানে কোথায় আসা হয়েছে? কার বাড়ী যাবেন?'

বল্লাম, 'বিনোদপুর যাব।'

লোকটা যেন আবার চমকে উঠল, 'বিনোদপুর? সে এখানে কোথায়!'

বিরক্ত হয়ে বল্লাম, 'এটা যে বিনোদপুর নয় তাত' আপনাদের দেখেই বুঝতে পাচ্ছি।' লোকটা একটা আওয়াজ কর্ল, 'হুম! কার বাড়ীতে যাবেন?'

এইবার বিপদে পড়লাম। পাত্রীর বাবার নামটাও আবার জানি না। বল্লাম, 'দেখুন মশাই ভদ্রলোকের নামটা আমার জানা নেই।' কথা শেষ কর্তে না কর্তেই চারপাঁচ জন লোক বলে উঠল, 'পথে এস বাছাধন।' তাদের ব্যাপার দেখে বুঝলাম শালারা সহজে ছাড়বে না। ছাড়তও না, এমন সময় এক ভদ্রলোক ভিড় ঠেলে, 'কি ব্যাপার কি?' বলতে বলতে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। যে লোকটা আমার সঙ্গে কথা বলছিল সে বলে উঠল, 'আপনি এসে গেছেন, আপনার কাছেই লোক পাঠাব ভাবছিলাম; দেখুন ত কি কাণ্ড রাতদুপুরে—কোথা থেকে এখানে এসে বলে বিনোদপুর যাবে—'

ভদ্রলোক ততক্ষণ সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভদ্রলোকের হাবভাব দেখে বুঝলাম ইনি একজন ভদ্রলোক। হাত তুলে নমস্কার কর্লাম।

ভদ্রলোক আবার একচোট প্রশ্ন কর্লেন। আবার তার উত্তর দিলাম। শেষে বল্লেন, 'এলেন কি করে এত রাত্রে?'

বল্লাম, 'গোরুর গাড়ীতে এসেছি—ঐ যে গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে।'

এ কথাটা এতক্ষণ কারুর খেয়াল হয়নি। ভদ্রলোক বোধহয় আমার অবস্থাটা বুঝতে পার্লেন। বল্লেন, 'গাড়োয়ান কই?'

বল্লাম, 'গাড়ীতেইত ছিল?'

একজন গাড়ীর কাছে গিয়ে ঘুরে এসে বল্ল, 'কোথায় গাড়োয়ান? গাড়ীতে কেউ নেই?'

বুঝলাম গাড়োয়ান ব্যাটা আমার চেয়েও চালাক। মানুষ যে ভূতের চেয়েও সাংঘাতিক গাড়োয়ানটা বোধহয় তা জানত। তাই চেঁচামেচি শুনে ভূতের ভয় ভুলে গিয়ে কোথায় দৌড় মেরেছে। যাই হোক আমার অবস্থাটা দেখে বল্লেন, 'আপনি আসুন আমার সঙ্গে।'

ভদ্রলোকের কথা শুনে যেন ধড়ে প্রাণ এল। বল্লাম, 'চলুন'।

ভিড়ের বাইরে এসে দেখি একটা ভোজপুরী দরওয়ান একটা বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভদ্রলোক বল্লেন, 'চল তেওয়ারী।'

বুঝলাম ভদ্রলোকটি যেই হন নেদো পটলা জাতীয় জীব নন। ভদ্রলোকের সঙ্গে তার বাড়ীতে এসে উঠলাম। বাড়ীত নয় ছোটখাট একটা প্রাসাদ। ভেতরে ঢুকে একটা ঘরে আমায় বসিয়ে বল্লেন, 'মুখ দেখেত মনে হচ্ছে, খাওয়া দাওয়া হয়নি। আপনি একটু বসুন, আমি খাবার জোগাড় কর্ত্তে বলি।'

ক্ষিদে পেয়েছিল খুবই কিন্তু রাত্রি বারটার সময় পাড়াগাঁয়ে আবার কি খাবার জোগাড় কর্বেন ভদ্রলোক, এই ভয়ে বল্লাম, 'তার কিছু দরকার নেই; আপনি বরং একটা লোক দিন, আমায় বিনোদপুর পৌছে দিয়ে আসুক।'

ভদ্রলোক আমার কথা শুনে হেসেই অস্থির। বল্লেন, 'পাগল নাকি? বিনোদপুর এখান থেকে পুরো চারমাইল রাস্তা—তাও রাস্তা দিয়ে যেতে হলে ছ'মাইলের মত হবে—এতরাত্রে কোথায় যাবেন? খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন; কাল সকালে সব ব্যবস্থা হবে।' বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বল্লেন, 'মুখ হাত ধুয়ে নিন্, একটু কথাবার্তা বলি, ততক্ষণ খাবার তৈরী হয়ে যাবে।'

তাই কর্লাম। হাতমুখ ধুয়ে জামাকাপড় ছেড়ে বসলাম। ভদ্রলোকের বয়স মনে হল বত্রিশের কাছাকাছি—handsome চেহারা মাইরী—বেশ আভিজাত্য আছে চেহারার মধ্যে।

ভদ্রলোক বল্লেন, 'তোমায় দেখেত' বড় ছেলেমানুষ বলে মনে হচ্ছে। তোমায় 'আপনি' বলতেও আমার বাধছে। তুমি বল্লে রাগ কর্বে না ত হে?'

ভদ্রলোকের কথা বলার ভঙ্গীটা এমন সুন্দর যে, বল্লাম, 'না-না রাগ কর্ব কেন? আপনি তুমিই বলুন না।'

'তোমার নামটি কি বল্লে? অনল? বেশ নামটি ত। আমার নাম কুমারনাথ মিত্র। পাড়ার ছেলেরা আমায় বড়দা বলে ডাকে। তুমি ইচ্ছা কর্লে কুমারদাও বলতে পার—'।

হেসে বল্লাম, 'আপনাকে আমিও বড়দাই বলব।'

ভদ্রলোক বল্লেন, 'বেশত! বেশত!'

অনলের কথার মাঝখানে কালীধন বলিল, 'প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য শেষ হল, এবার দ্বিতীয় দৃশ্যের সুরু।'

অনল হাসি চাপিয়া বলিল, কর্ছি।—কিছুক্ষণ পরে খাবার ডাক এল। ভদ্রলোক বল্লেন, 'চলহে, খেয়ে নেবে।' বলার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়লাম। বারান্দায় খেতে দেওয়া হয়েছে। Welcome লেখা

কার্পেটের আসনে বোসে welcome করে ত বসলাম। ভদ্রলোক বল্লেন, 'এতরাত্রে আর ভাতের হাঙ্গাম কর্লাম না। অন্য আয়োজনও সম্ভব নয়; শুধু লুচি আর দু'একটা ভাজা দিয়ে রাত্রির খাওয়া সেরে নাও। কাল সকালে আবার দেখা যাবে।' 'বল্লাম, ওই যথেষ্ট; মারের বদলে যে লুচি খাচ্ছি এই ঢের।' ভদ্রলোক কথাটা শুনে হেসে উঠলেন। বল্লেন, 'মারবার যোগাড় করেছিল নাকি?'

'বলেন কি! যে অবস্থা করে তুলেছিল, আপনি না গেলে যা হত বুঝতেই পাচ্ছি।' ভদ্রলোক যেন আমার কথাটা শুনে বেশ মজা পেলেন; বল্লেন, 'বটে! বেনু খাবারটা দিয়ে যা।' এবং খাবার নিয়ে যিনি এলেন তাকে দেখিয়ে ভদ্রলোক বল্লেন, 'এটি আমার বোন বেনু, ভাল নাম মিনতি। ইনি অবশ্য এখানে লুচিভাজা থেকে আরম্ভ করে বাসন পর্যন্ত মাজেন—তবে কলকাতায় গেলে উনি ফাষ্ট ক্লাসের ছাত্রী—সামনের বছরে ম্যাট্রিক দেবেন।' আমি, 'তাই নাকি?' বলে, মেয়েটার মুখের পানে তাকাতেই যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এত রূপ যে জগতে থাকতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

কালীধন বলিল, 'অত্যুক্তি কর্চ্ছ না ত?'

অনল প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বলিল, 'মাইরী না।'

কালীধন বলিল, 'বেশ। তারপর?'

অনল বলিল, খেতে খেতে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা কর্লেন 'কি হয়েছিল এবার বলত শুনি?' আনুপূর্বিক ঘটনা খুলে বল্লাম। সব শুনে তিনিও যত হাসেন, বেনুও তত হাসে। শেষে ভদ্রলোক বল্লেন, 'তাহলে খুব দুর্ভোগ হয়েছে ত তোমার?'—স্বীকার না করে উপায় কি? বল্লাম, 'তা কিছুটা হয়েছে বটে।'

বেনু বলে উঠল, 'বেশ হয়েছে। আপনার মার খাওয়াই উচিত ছিল। অবাক হয়ে বল্লাম, 'কেন আমার অপরাধ?' বল্ল, 'যার বাড়ী

নেমন্তন্ন খেতে এসেছেন তাঁর নাম জানেন না আপনি? এরকম বোকাও ত দেখিনি।' ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠে বল্লেন, 'ঠিক বলেছিস্ বেনু বোকাই বটে; দে দে বেশী করে লুচি দে—খেয়ে দেয়ে বুদ্ধিটা খুলুক।' বেনু লুচি দিতে এসেছিল, বল্লাম, 'মাপ কর্বেন, আর পার্বনা।' সে বল্ল, 'খাঁটি বিয়ের লুচি, খেয়ে নিন্, মাথায় কিছুটা ঘি হবে।' হেঁট হয়ে লুচি দিচ্ছিল—ওধারে ভদ্রলোক বসে আছেন। বেনু তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল। কথাটা শুনে মুখ তুলে চাইলাম—দেখি আমার মুখের পানে সেও তাকিয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি কি রকম অদ্ভুত বলে মনে হল। চোখেরও যে একটা ভাষা আছে তা যেন সেইদিনই প্রথম বুঝলাম। আমাদের দুজনের মুখের মধ্যে তফাৎও ছিল সামান্যই—ভাগ্য ভাল কিছু অসভ্যতা করে ফেলিনি।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে উঠে এলাম। একটা ঘরে শোবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন ওঁরা। শুলাম। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসেনা। কেবলই বেনুর মুখটা মনে পড়ে।

আমি বলিয়া উঠিলাম, 'Love at first sight?'

চরম অবজ্ঞার সহিত ললাট কুঞ্চিত করিয়া অনল বলিল, 'Love, hooh!'

হাসিয়া বলিলাম, 'তবে?'

সে যেন একটু বিরক্ত হইয়াই বলিল, 'ওসব বাজে জিনিষ নিয়ে অনল মুখুজ্জে মাথা ঘামায় না। অন্তর টন্তর নিয়ে পাগলামী কর্বে তারা যাদের সত্য কথা বলার মত সাহস নেই। নির্জন রাত্রে ভালবাসার কথা ভেবে মাথা ঘামানর মত পাগল আমি নই। What I was thinking was sex and nothing else—তার দেহটাকেই আমার প্রয়োজন ছিল।'

তাহার কথাগুলি যেন আমায় চাবুক মারিয়া সজাগ করিয়া দিল। এতক্ষণ তাহার কথা বলার অনবদ্য ভঙ্গী মনের মধ্যে একটু আশার সঞ্চার

করিতেছিল। ভাবিয়াছিলাম অনল এ যাবৎ নারীদের সম্বন্ধে অবজ্ঞাই প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে, ভালবাসার প্রয়োজন অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে—এইবার সে হয়ত বুঝিতে পারিয়াছে ভালবাসা বলিয়া সত্যই কিছু একটা আছে। কিন্তু তাহার শেষের কথাগুলি শুনিয়া আমার সেই ভুল তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। বুঝিলাম তাহার দম্ভ, তাহার অপরাজেয় পৌরুষেরই জয় হইয়াছে।

কালীধন বলিল, 'Carry on.'

অনল বলিল, 'সকাল বেলা উঠলাম। চা খাবার দিতে এল বেনু।'

বল্লাম, 'বড়দা কোথায়?'

বেনু বল্ল, 'পুজায় বসেছেন।'

অবাক হয়ে বল্লাম, 'পূজা? তিনি পূজাও করেন নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'পূজো শেষ হবে কখন?'

'তা আটটা বাজবে।'

মনে মনে একটু সাহস পেলাম। ভাবলাম যাক্ এখনও বেশ কিছুক্ষণ বেনুকে কাছে পাওয়া যাবে। বল্লাম, 'আপনাদের এ জায়গার নাম কি?'

'মাঝের গ্রাম।'

বলে সে চলে যাচ্ছে দেখে বল্লাম, 'বাঃ, চলে যাচ্ছেন যে বড়?'

ফিরে দাঁড়িয়ে বল্ল, 'কি কর্ব?'

বল্লাম, 'বেশ লোক ত! আমি কি এখানে একা বসে থাকব নাকি?'

কোন কথা না বলেও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি এগিয়ে গিয়ে তার হাতটা ধরে বল্লাম, 'আপনার উপর জোর কর্তে চাইনা, চুপচাপ এই চেয়ারটায় বসুন, যতক্ষণ না আমার চা খাওয়া শেষ হয় ততক্ষণ এইখানে বসে থাকতে হবে।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আমি বলিলাম, 'সর্বনাশ তার পর?'

অনল হাসিয়া বলিল, 'সর্বনাশের এখনও অনেক ঢের দেরী। হাত ধরতেই সে প্রথম চমকে উঠল। কিন্তু কথাটা শুনে একটু হেসে বল্ল, 'ছাড়ুন বসছি।' বেণু বসল। বল্ল,' আপনি এর আগে কখনও গ্রামে আসেন নি?"

'না, কেন?'

'এমনি জিজ্ঞাসা কর্ছি। তাহলে প্রথম অভিজ্ঞতা হিসাবে মন্দ হল না আপনার?'

বল্লাম, 'তাত বটেই, সবদিক দিয়েই লাভ হল!' খুব চালাক মেয়ে। আমার কথার উত্তরে কোন কথাই সে বল্ল না। তখন মনের মধ্যে যে কি হচ্ছে তা আর কি বলব বড়দা? ইচ্ছা কর্ছিল—' উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে অনল বোধ করি একটা অশ্লীল মন্তব্যই করিল।

কালীধন বাধা দিয়া বলিল, 'আঃ অনল, Don't be vulgar.'

অনল চকিতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, 'I am sorry.' বেণুকে বল্লাম, কথায় বলে ভগবান যা করেন ভালর জন্যই।' সে কথারও কোন জবাব না দিয়ে সে চুপ করে রইল। বল্লাম, 'আপনি কি কোন কথাই বলবেন না।' বল্ল, 'কি বলব?' বল্লাম, 'কিছু একটা বলুন।' চেয়ার থেকে উঠে পড়ে সে বল্ল, 'শুধু শুধু কতকগুলো বাজে কথা বলে লাভ কি?' চটকরে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বল্লাম, 'সেটি হচ্ছে না। চা খাওয়া এখনও আমার শেষ হয়নি।' হেসে ফেলে ও বল্ল, 'আমি সামনে থাকলে আপনার চা খাওয়া হবেও না।' She gave me a hint—I could not check myself—চায়ের কাপটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে suddenly I embraced her and kissed her!

কথাগুলি শুনিয়া কালীধনের ললাটরেখায় সামান্য কুঞ্চন দেখা

দিল মাত্র। কিন্তু রাগে ঘৃণায় আমার সর্বশরীর যেন জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। ভাবিলাম কি অপরিসীম স্পর্দ্ধা ইহার। সামান্য পরিচয়ের সূত্র ধরিয়া একটি অনভিজ্ঞা বালিকার কৌমার্য নষ্ট করিবার কি দুর্জ্জয় সাহস! এবং নিজের কামোন্মত্ত পাশবিক প্রচেষ্টার কাহিনী সদম্ভে ঘোষণা করিতে সে কিছুমাত্র লজ্জা অনুভব করিল না।

অনল আবার সুরু করিল; 'নিজেকে মুক্ত কর্বার ব্যর্থ চেষ্টা কর্ল কিছুক্ষণ—একটু পরে যখন ছেড়ে দিলাম তখন সমস্ত মুখ লাল হয়ে গেছে তার। বল্ল, 'দাদা ডেকে এনেছেন, 'আপনাকে তাই আর অপমান কর্তে চাই না। কিন্তু ভবিষ্যতে এরকম অভদ্রতা আর কর্বেন না; পরিণামে অনেক দুঃখ আছে বলে রাখলাম।' বলে সে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে তার দাদা এলেন, বল্লেন, 'ভায়ার চা খাওয়া হল?'

বল্লাম, 'হ্যাঁ।'

'তবে চল তোমার গাড়ী তৈরী হয়ে আছে, পৌঁছে দিয়ে আসুক।'

বাধা দিয়া আমি বলিলাম, 'অত অপমানেও তোর শিক্ষা হল না।'

অনল বলিল, 'অপমান? সামান্য দুটো কথায় অপমান বোধ কর্ব? ক্ষেপেছিস্ তুই? তাছাড়া আমিত কোন অন্যায় করিনি?'

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'বলিস কি? এটা অন্যায় নয়—একটা মেয়েকে জোর করে—'

কথা শেষ করিতে না দিয়া অনল বলিল, 'There is nothing unfair in war and love.'

বল্লাম, 'This is not love.'

উত্তেজিত হইয়া অনল বলিল, 'Why not?'

কালীধন আমাদের দুইজনকে নিরস্ত করিয়া বলিল, 'আগে শেষ হোক্ ওর কাহিনী, তারপর বিচার হবে।'

অনল আবার সুরু করিল, 'রাত্রে বিবাহ বাসরে গান গাইবার ভার পড়ল আমার উপরে। দুখানা গান করার পর পাত্রের মামা বল্লেন বাঁশী বাজাতে—আমিও তাই চাইছিলাম। পুরাকালে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে শ্রীরাধিকা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন, এ যুগের শ্রীরাধিকারাও যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম কর্বেন না, তা জানতাম। বাঁশী থামার পর কেউ আর কোন কথা বলে না। সামনের দালানে মেয়েদের মধ্যে বসেছিল বেণু—চকিতে তার মুখের পানে চেয়ে দেখলাম —সেও তাকিয়ে আছে আমার পানে। কি অদ্ভুত চাহনি! বুঝলাম সুরের প্রতিক্রিয়া সুরু হয়ে গেছে। এক ফাঁকে তাকে একা পেয়ে বল্লাম, 'আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।'

আমার মুখের দিকে না তাকিয়েই বল্ল, 'বলুন।'

বল্লাম, 'আমায় ক্ষমা কর্তে হবে আপনাকে।'

কোন কথা বলে না। বল্লাম, 'কি হল জবাব দিন।'

'কি বলব?'

বল্লাম, 'যা খুশী বলুন। গালাগালি দিন, অপমান করুন, কিন্তু চুপ করে থাকবেন না।'

হেসে ফেল্ল সে। বল্ল, 'আচ্ছা পাগলত!'

বল্লাম, 'যাক্ হেসেছেন যখন তখন ধরে নিলাম আর রাগ নেই—'

'জানি না যান্'—বলে বেণু চলে গেল। And my dream came to be true. বেণুর বড়দার কাছে নিমন্ত্রণ পেলাম যাবার সময় তাদের বাড়ী হয়ে যাবার জন্য। And readily I accepted the invitation—শেষে দুটো দিন সেখানেই ছিলাম। এবং সে দুটো দিনের প্রথম দিনটা কেটেছে দুর্গজয়ের আয়োজন করে, শেষ দিনে I conquered her—বলিয়া ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার আমার পানে চাহিল।

সে যে কিছুই বলিতে বাকী রাখিল না তাহা স্পষ্টই বুঝিতে

পারিলাম। শেষ পর্যন্ত সে যে সেই কুমারীটির পবিত্রতাটুকু নিঃশেষে অপহরণ করিয়া লইয়াছে তাহাও বুঝিতে কষ্ট হইল না। তাহার কথা শুনিয়া অপরিসীম ঘৃণায় সর্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। এবং সেই অদেখা কুমারীটির অপরিশোধনীয় ক্ষতির কথা ভাবিয়া স্বতঃই তাহার প্রতি সহানুভূতি জন্মিল। ভাবিলাম, নিদারুণ প্রবঞ্চনায় আত্মবিস্মৃত হইয়া সেই অনভিজ্ঞা কুমারীটি এই নির্মম মানুষটার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া যে কতখানি ভুল করিয়াছে তাহা সে জানেও না। সে ধারণা করিতে পারিবে না যে লোকচক্ষুর অন্তরালে বসিয়া তাহার কুমারী জীবনের চরম সম্পদটুকু সব লজ্জা সব সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া, যে মানুষটাকে একান্ত আপনার মনে করিয়া তাহার পায়ে নিজেকে উজাড় করিয়া দিয়াছে, সেই মানুষটা আজ সগর্বে নিজের শক্তি এবং চাতুর্যের প্রশংসা করিয়া কতখানি আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। এবং নির্লজ্জের মত সেই কাহিনীকে নিজের বিজয়গৌরব বলিয়া লোক সমক্ষে প্রচার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিল না।

বলিলাম, 'সত্যি করে বলত, যা করেছিস্ তার জন্যে কি কিছুমাত্র দুঃখিত হস্‌নি?'

অনল বলিল, 'আমি আমার কোন কাজের জন্যই দুঃখিত হওয়ার কোন প্রয়োজন দেখি না।'

বলিলাম, 'কিন্তু তুমি মেয়েটিকে ঠকিয়েছ?'

সজোরে আমার কথার প্রতিবাদ করিয়া সে বলিল, 'কক্ষণও নয়—মন জয় করার art—'

বাধা দিয়া বলিলাম, 'বাজে বকিস্‌নে অনল! লোককে ঠকানটা মোটেই art নয়।'

অনল বলিল, 'তুই শুধু শুধু চটে যাচ্ছিস্ কেন? এতে তোর কি ক্ষতিটা হল?'

ভাবিলাম বলি, এমনি একটা ক্ষতির হাত হইতে একজনকে রক্ষা করিয়াছি, তাই এই ক্ষতির কথা শুনিলে স্বতঃই সেই পুরাতন কথা মনে পড়িয়া যায়। কিন্তু কিছুই বলিলাম না। কারণ জানি এইসব কথা তাহাকে বলিয়া কোন লাভ নাই। তাই চুপ করিয়াই রহিলাম।

একধরণের পোকা আছে যেগুলি আগুণ দেখিলেই জ্ঞানহারা হইয়া ছুটিয়া আসিয়া আগুণের শিখার উপর ঝাপাইয়া পড়িয়া স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন দেয়। অনলকে দেখিলেই আমার সেই পতঙ্গগুলির কথা মনে হইত। অনলের অন্তরস্থিত অগ্নিশিখা সংসারের বহু পতঙ্গেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এবং সেই পতঙ্গগুলিও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া অসঙ্কোচে অনলের প্রজ্বলিত কামনার শিখায় ইন্ধন যোগাইয়া নিঃশব্দে আত্মবিসর্জন দিয়াছে। প্রথমে অনলেরই উপর রাগ হইত। কিন্তু কিছুদিন পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম অনল উপলক্ষ্য মাত্র। পতঙ্গের ধর্মই হইল প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় আত্মবিসর্জন দেওয়া। ইহার জন্য অগ্নিকেও যেমন দোষ দেওয়া চলে না, তেমনি পতঙ্গদেরও দোষ দেওয়া যায় না। এবং এই সত্যটা বুঝিতে পারিয়া ধীরে ধীরে অনলকে মনে মনে ক্ষমা করিয়াছিলাম। তবুও সময়ে সময়ে তাহার মুখে উত্তপ্ত কামনার এই নির্লজ্জ জয়গান শুনিতে শুনিতে মনে হইত ছেলেটা বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই এই আত্মক্ষয়ী পথটা বাছিয়া লইয়াছিল। আত্মক্ষয়ী বলিলাম এই জন্য যে, অত্যুগ্র কামনার চরিতার্থতার মধ্যেই যে জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষা পরিসমাপ্তি লাভ করিতে পারে, একথা কখনই বিশ্বাস করি নাই। কালীধন যে বলিত 'ছেলেটার কিছুরই অভাব নাই, সবই আছে, শুধু মাত্র পথের পরিচয় জানা না থাকায়, সে শুধু অন্ধের মত সংসারের সর্বত্র আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াই ফিরিল'; তাহা আমিও জানিতাম এবং সত্য বলিয়া মানিতাম। বুদ্ধি মেধা, উদ্যম প্রভৃতি বাস্তব জীবনের অতি প্রয়োজনীয় কোন গুণেরই অভাব দেখি নাই তাহার

মধ্যে। কিন্তু উদ্দেশ্যবিহীন জীবনযাপনের অদ্ভুত ইচ্ছা এবং অন্তরস্থিত প্রবল চাঞ্চল্য তাহার সমস্ত জীবনটাকে নিরন্তর ব্যর্থতার পানে পরিচালিত করিয়া, অকস্মাৎ একদিন যৌবনের মধ্যদিনে তাহার সব কিছুর উপর যবনিকা টানিয়া দিয়াছিল। সেদিন লোক চক্ষুর অন্তরালে বসিয়া তাহার কথা স্মরণ করিয়া নিজের অন্তরে যে গভীর বেদনা অনুভব করিয়াছিলাম, আজও তাহা মনে পড়ে। ইচ্ছা করিলে সে যে আমাদের মত যে কোন মানুষের অপেক্ষা অনেক বেশী খ্যাতি অর্জন করিতে পারিত তাহা জানিতাম। আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাহার সামান্যতম প্রচেষ্টা এবং ঐকান্তিকতা যে আমাদের মত বহু মানুষের অপেক্ষা অধিক সাফল্য এবং গৌরবের সহিত জয়লাভের সহায়তা করিত তাহাও জানিতাম। কিন্তু তাহার ধার দিয়াও গেল না সে। কেন যে যায় নাই আজও তাহা বুঝিতে পারি নাই। এবং আজও মাঝে মাঝে নিজেকে এই প্রশ্ন করিয়াছি কিন্তু কোন জবাব পাই নাই। কোন এক অজ্ঞাত খেয়ালের বশবর্তী হইয়া অর্থ, খ্যাতি, সুখশান্তি সব কিছু চরম অবহেলার সহিত পায়ে ঠেলিয়া সে যে পথ বাছিয়া লইয়াছিল, সেই পথে চলার সার্থকতা আজও বুঝিতে পারি নাই। বহুবার তাহাকে বহু প্রশ্ন করিয়াছি; কোনটার জবাব দিয়াছে, কোনটার জবাবে নিঃশব্দে হাসিয়া চুপ করিয়া গিয়াছে। পীড়াপীড়ি করিলে উদাস কণ্ঠে বলিয়াছে 'ঠিক জানি না কেন করি'; ইহাও যে তাহার সত্য কথা তাহাও বুঝিতাম। বুঝিতাম বলিয়াই তাহার অনেক অপরাধ নীরবে ক্ষমা করিয়াছি। এবং সংসারের অধিকাংশ মানুষ যখন তাহার নীতি এবং রুচিবিগর্হিত কার্যকলাপ দেখিয়া তাহাকে নির্বাসন দিয়াছে তখনও তাহাকে ফেলিতে পারি নাই। শুধু যে ত্যাগ করিতে পারি নাই তাহাই নহে; তাহার সহিত চিরবিচ্ছেদের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে যে আমায় দুর্বার বেগে আকর্ষণ করিয়াছে, সে আকর্ষণের বেগও প্রতিহত করিতে পারি নাই।

ছাত্রজীবনের প্রথম পরিচয়ের মুহূর্ত হইতে নিয়তির চক্রান্তে যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আমরা পরস্পর আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম, পরবর্তী জীবনে বহু ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যেও সেই বন্ধন ছিন্ন হয় নাই। আমাদের উভয়ের মত এবং পথের বহু বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও তাহাকে ত্যাগ করিতে পারি নাই। আমার প্রতি তাহার ভালবাসার পরিমাণ নির্ণয় করিবার চেষ্টা কোনদিন করি নাই। কারণ জানিতাম, তাহার মতে স্নেহ ভালবাসা মায়া মমতা সবকিছুই স্নায়বিক দৌর্বল্য মাত্র। কিন্তু একদিন সত্যই আসিল যেদিন নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিয়াছিলাম যে, সেই সর্ববাদিসম্মত হৃদয়হীন মানুষটা কি গভীর ভাবেই না আমায় ভালবাসিয়াছিল। যতদিন সে আমাদের মধ্যে ছিল ততদিন নানাভাবে তাহার চাঞ্চল্য সংযত করিবার জন্য তাহাকে বহু উপদেশ দিয়াছি। কিন্তু প্রতিবারই নিদারুণ অবজ্ঞার সহিত সে আমার স্নেহান্ধ অন্তঃকরণে কঠিন আঘাত করিয়া আমার সব উপরোধ অনুরোধই অবহেলা করিয়াছে। জীবিতাবস্থায় আমার ভালবাসার কোন মর্যাদাই সে দেয় নাই কখনও।

একদিন কলেজের পর বাড়ী ফিরিয়া পড়িতে বসিবার উদ্যোগ করিতেছি, সহসা অনল আসিয়া উপস্থিত হইল। নমিতার বিবাহের পর সে আমাদের বাড়ী আর আসে নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি ব্যাপার ?'

বলিল, 'চল্ একটু বেড়িয়ে আসি।'

দুইজনে বাড়ীর কাছাকাছি একটা পার্কে গিয়া বসিলাম। পকেট হইতে সিগারেটের পেকেট বাহির করিয়া একটা সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল, 'কয়েকটা কথা বলব অরুণ ? কিন্তু এসব কথা কারুর কাছে বলতে পাবি না। কালীধনকেও নয়।'

বলিলাম, 'বেশ বল কি কথা ?'

এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, 'বলছি—কিন্তু আর একটা কথা। যা বলব তোকে বিশ্বাস কর্তে হবে।'

একটু অবাক হইয়া গেলাম, এ আবার কি? বলিলাম, 'যদি বিশ্বাস করার মত হয় তাহলে বিশ্বাস কর্ব না কেন?'

বলিল, 'প্রথম শুনে বিশ্বাস না করাই স্বাভাবিক।'

বলিলাম, 'আচ্ছা বলত শুনি।'

বলিল, 'প্রথমে গোটা কতক প্রশ্ন কর্ব তোকে ; আগে জবাব দে—'

বলিলাম, 'তবেই ত মুস্কিলে ফেল্লি। তোর প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। বরং কালীধনকে জিজ্ঞাসা করিস্ সে বলতে পার্বে।'

বলিল, 'দুর্! ডিক্সনারী খুলে কথার মানে দেখে যদি পড়া তৈরী করা যেত তাহলে মাষ্টারের দরকার হত না। বড়দা হল ডিক্সনারী।'

তাহার উপমা শুনিয়া হাসিয়া বলিলাম, 'বল কি প্রশ্ন তোর?'

'আচ্ছা তুই আমায় ভালবাসিস্?'

উত্তর দিলাম, 'ও প্রশ্নটা বাহুল্য মাত্র। তোর দ্বিতীয় প্রশ্ন বল?'

ব্যস্ত হইয়া বলিল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, ওকথা যাক্। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আমার সম্বন্ধে তোর কি ধারণা?'

বলিলাম, 'সেটা জেনে তোর লাভ?'

বলিল, 'লাভ? বিশেষ কিছু নেই—তবুও এমনি জানতে চাইছি।'

জবাব দিলাম, 'এসব প্রশ্নের জবাব না পেলে কি তুই আমায় যা বলতে চাস্ তা বলবি না?'

অনল বলিল, 'না-না তা নয়। এই প্রশ্নটার জবাব পেলে আমার একটু সুবিধা হত।'

বলিলাম, 'আমি কিন্তু তোর মত গুছিয়ে বলতে পার্ব না। তবে তোর সম্বন্ধে একটা কথা প্রায়ই মনে হয় সেটা হচ্ছে যে তুই ইচ্ছা করে নিজের ক্ষতি কর্ছিস্?'

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'ক্ষতি?'

বলিলাম, 'হ্যাঁ! তুই যেসব কাজ করিস্ তার স্বপক্ষে তুই যতই যুক্তি দেখাস্ না কেন, সে সব যুক্তির মধ্যে সত্য নেই। আজ হয়ত এসব কাজের মধ্যে ক্ষণিক আনন্দ পেতে পারিস্, কিন্তু এমন দিন আসবে তোর জীবনে, যখন আজকের দিনগুলোর জন্যে তোর মনে তীব্র অনুশোচনা জাগবে? কিন্তু তখন হয়ত আর কোন উপায়ই থাকবে না? শুধু সেই অনুশোচনার জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মর্বি আর কাঁদবি। অথচ এখনও যথেষ্ট সময় আছে। ইচ্ছা কর্লেই নিজেকে শুধরে নিতে পারিস্। এবং একই ভুলের পুনরাবৃত্তি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারিস। কারণ এই ভুল তোর শুধু ক্ষতিই কর্বে, একবিন্দু লাভ হবে না কিছু।'

কথাগুলি খুব গভীর মনোযোগের সহিত শুনিয়া বলিল, 'বুঝেছি তুই কি বলতে চাস্, এবং কথাগুলো তোর সত্য তাও জানি। তবুও দু'একটা কথা বলতে চাই তোর সঙ্গে—তর্ক কর্ছি তা মনে করিস্নি কিন্তু।'

বলিলাম, 'বল্'।

বলিল, 'তুই বল্লি এমন দিন আসবে যখন আমার মনে অনুশোচনা জাগবে। কিন্তু যদি বলি সেরকম দিন কখনও আসবে না।'

বলিলাম, 'তা এখন থেকে বলা সম্ভব নয়। কারণ মানুষের জীবনে কখন কি রকম সময় আসে তা বলা যায় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পার্থক্যই মানুষকে পরিবর্তিত করে। আজ যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে আছিস, চিরদিনই যে সেই একই পরিবেশের মধ্যে থাকবি এমন ত কিছু নিশ্চয়তা নেই।'

কথাটা স্বীকার করিয়া লইয়া বলিল, 'তা নেই সত্যি। কিন্তু যদি বলি সেরকম দিন আসার আগেই নিজেকে সরিয়ে নেব।'

মনে পড়িয়া গেল আরও একদিন সে কথাচ্ছলে এমনি করিয়া স্বেচ্ছামৃত্যুর সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছিল। সেদিনও তাহার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি নাই; আজও যে করিলাম তাহা নহে। তবুও কথাগুলি অন্তঃসারশূন্য আস্ফালন বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলাম না।

বলিলাম, 'নিজের জীবন সম্বন্ধে অতখানি নিশ্চয়তা ঠিক নয়।'

ছেলেমানুষের মত সে বলিয়া উঠিল, 'কেন নয়? আমার যদি বাঁচতে ভাল না লাগে, যদি বলি যে আমার বেঁচে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তাহলে কি এক মুহূর্তও আমি বাঁচব ভেবেছিস্?'

আবার সেই আত্মহত্যার সম্বন্ধে ইঙ্গিত!

বলিলাম, 'আত্মহত্যার মধ্যে বীরত্ব কিছু নেই। আত্মহত্যা করা মানে কাপুরুষতা।'

উচ্চৈস্বরে অনল বলিয়া উঠিল, 'বইতে ঐ কথাটাই লেখা আছে বটে। কিন্তু যাঁরা লিখেছেন তাঁরা জানতেন যে আত্মহত্যা কর্তে যতখানি সাহসের প্রয়োজন হয়, তা তাঁদের ছিল না।'

বলিলাম, 'আত্মহত্যা করার মধ্যে সাহস থাকে না; বুদ্ধি বা বিবেচনাশক্তি বিকৃত না হলে কেউ আত্মহত্যা করে না।'

হাসিতে হাসিতে বলিল, 'ভুল অরুণ, ভুল। এমন লোকও আছে যে সুস্থচিত্তে আত্মহত্যা কর্তে পারে।'

বলিলাম, 'তা যদি তুই ভেবে থাকিস্ তাহলে তুই যা ইচ্ছা কর্তে পারিস্। আমার কিছু বলার নেই।'

আমার পিঠের উপর একটা হাত রাখিয়া সে বলিল, 'তুই চটে গেলি অরুণ? তুই চটলে যে আমার আর কিছু উপায় থাকে না।'

বলিলাম, 'না, তোর উপর রাগ করিনি। তোর উপর রাগ কর্তে পার্লে ত ভালই হত। কিন্তু রাগ কর্তে পারিনে যে।'

অনল বলিল, 'যাক্ তোকে যা প্রশ্ন করছিলাম তার উত্তর কিছুটা

পেয়েছি। এবার তোকে যা বলবার জন্য ডেকেছি তাই বলি। তুই আমায় যে কথাগুলি বল্লি আমিও ঠিক সেই কথাগুলিই বলতে চাই। আমার যে সমস্ত কাজগুলো সাধারণের চোখে দৃষ্টিকটু ঠেকে সেগুলো কেন যে করি তার কারণ আমি নিজেই ঠিক জানি না রে অরুণ? খুব যে ভাল লাগে বলে করি তাও নয়। তুইত জানিস্ মেয়েদের সম্বন্ধে আমার একটু বেশী রকম দৌর্ব্বল্য আছে। কথাটা আমি নিজেও স্বীকার করছি। মেয়েদের নিয়ে অযথা সময় নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। তাদের দেহটা ছাড়া তাদের কাছে চাইবার মত আর কিছুই আমার নেই। তুই হয়ত বলবি 'এটা সুস্থচিত্তের লক্ষণ নয়।' তাও আমি মানি। কিন্তু মেয়েদের কাছে গেলেই কেমন যেন একটা উন্মাদনা জাগে। নিজেকে কিছুতেই সংযত রাখতে পারি না। মাঝে মাঝে সংযত করার চেষ্টাও যে করিনি তা নয়। করেছি। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই ভেবেছি কি লাভ? যা আসে আসুক, যা হবার হোক্। মুহূর্ত্তে মনে হয়েছে, ধর্ম মিথ্যা সমাজ মিথ্যা। সত্য শুধু আমার মনের উন্মাদনাটুকু। এ চাঞ্চল্য যে কি, তুই বুঝবি না অরুণ।' কথাগুলি বলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অনল চুপ করিল।

সত্যই তাহার অন্তর্গূঢ় চাঞ্চল্যের বিরাটত্ব বা তাহার গভীরতা উপলব্ধি করিবার শক্তি আমার ছিল না। অনলের নিজমুখে নিজের অসংযত আচরণের অকপট স্বীকৃতি কিছু নূতন নহে। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় তাহার স্বীকৃতিটুকু নিছক স্বীকৃতি বলিয়া মনে হয় নাই। তাহার কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিক পরিবর্তন এবং কথার গুরুত্ব স্বতঃই আমার মনকে আকৃষ্ট করিল। এবং কথাগুলিকে তাহার ব্যথিত চিত্তের অনুশোচনা বলিয়াই মনে হইল।

বলিলাম, 'কিন্তু দুর্বল মুহূর্ত্তটুকুই যে সত্যি নয় বা চিরস্থায়ী নয়,

এটাত বোঝা উচিত। ক্ষণিক উত্তেজনার বশে যে কাজটা কর্বি, তার পরিণামের কথাটাও একবার চিন্তা কর্বি না।'

বলিল, 'সে অবস্থায় ধীরভাবে চিন্তা করার শক্তি থাকে নারে!'

বলিলাম, 'কিন্তু এটাও ত তুই জানিস্ যে এটা অন্যায়।'

আমার কথা শুনিয়া তাহার সহসা কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হইয়া গেল। বলিল, 'অন্যায় বলতে পারি না।'

বলিলাম, 'তবে কি বলবি এটাকে?'

বলিল, 'কি যে বলব তা ঠিক জানিনে। কারণ সে কথা কখনও ভাবিনি, আজও ভাবি না। তবে এটুকু বলতে পারি যে এর স্বপক্ষে কোন সুচিন্তিত যুক্তি নেই।'

বলিলাম, 'এত কথা বুঝিস্ তবুও এপথে চলিস্ কেন?'

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, 'ঐ যে বল্লাম সেই অবস্থার মধ্যে আমি আমার সব যুক্তি হারিয়ে ফেলি। Reasons are swept away by passion.'

বলিলাম, 'মানুষের পরিচয় animality plus rationality.' মানুষ যে ভীষ্মদেব বা স্বামী বিবেকানন্দ নয় তা জানি। কিন্তু তাই বলে সব মানুষই উচ্ছৃঙ্খল হয় না। কারণ সামাজিক কতকগুলো বিধিনিষেধ দিয়ে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সীমা নির্দ্ধারণ করে দেওয়া আছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ বা সুবিধার জন্য সে সীমা লঙ্ঘন করে সমাজের অন্যান্য মানুষের শান্তিভঙ্গ করাটাও কোন মানুষের পক্ষে উচিত নয় বা যুক্তি যুক্ত নয়।'

গম্ভীর ভাবে অনল বলিল, 'তোকে প্রথমেই বলেছি যে তোর সঙ্গে তর্ক আমি কর্ব না। তবুও যে কথাগুলি বল্লি তার প্রতিবাদে দু'একটা কথা বলতে চাই। প্রথম কথা হচ্ছে তুই বল্লি Animality plus Rationality হচ্ছে মানুষের বর্ণনা। কিন্তু প্রশ্ন করি কোনটা মনুষ্যত্ব?'

বুঝিলাম সে নিজের শক্তিশালী যুক্তিবাদের সাহায্যে নিজের ধারণা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে। বলিলাম, 'অন্যান্য পশুর সাথে মানুষের তফাৎ হচ্ছে, মানুষ বুদ্ধির ক্ষেত্রে অনেক বেশী উন্নত। ভগবানের সৃষ্ট জীবদের মধ্যে—'

বাধা দিয়া অনল বলিল, 'ভগবান কথাটা বাদ দে, ওটার কোন সংজ্ঞা নেই।'

মনে পড়িয়া গেল অনল ঘোরতর নাস্তিক। বলিলাম, 'বেশ প্রকৃতি বল। Nature, তাহলে ত আপত্তি নেই।'

মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না।'

ছিন্ন কথার সূত্র ধরিয়া বলিলাম, 'প্রকৃতির নিয়মে মানুষ যে সমস্ত গুণ বা শক্তি নিয়ে এসেছে, প্রতি মানুষই চেষ্টা করে সে সমস্ত গুণ এবং শক্তির উত্তরোত্তর উৎকর্ষতা সাধনের জন্য। এই প্রচেষ্টাই মানুষের প্রকৃত পরিচয়। কিন্তু তুই যদি তা না করে প্রতিনিয়ত নিজের যৌন ক্ষুধার ইন্ধন যোগাবার জন্য ভালমন্দ কিছুরই বিচার না করে অন্ধের মত ছুটে চলিস্, তাহলে তার ফল কখনই ভাল হতে পরে না।'

নির্লিপ্ত কণ্ঠে অনল বলিল, 'বুঝলাম। তুই যা বল্লি তার সারমর্ম্ম হচ্ছে যে আমার বর্তমান জীবনের জন্য ভবিষ্যৎ জীবনে আমি অসুখী হব, তাই না?'

বলিলাম, 'কিছুটা তাই বটে।'

'কিন্তু কথা হচ্ছে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য আমি কিছুমাত্র চিন্তিত নই।'

বলিলাম, 'তোর কথাটা যদি সত্যি বলে মেনে নিতে হয়, তাহলেও বলব যে তুই ভুল পথে চলেছিস্। কারণ তুই যা কচ্ছিস্, তার ফলভোগ যদি তোকে একা কর্তে হত, তাহলে কিছু বলতাম না। কিন্তু তা নয়

—তুই একটা মেয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিষটি কৌশলে হস্তগত করে চিরদিনের জন্য তাকে নিঃস্ব করে দিচ্ছিস। মুহূর্ত্তের প্রয়োজনের চাহিদা মেটাবার জন্য ছলে বলে তাকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে এসে প্রয়োজনের শেষে তাকে অবহেলার সঙ্গে পরিত্যাগ কর্চ্ছিস্। তোর এই আচরণ কেউ সমর্থন কর্বে না।'

তার সুন্দর ওষ্ঠ বিকৃত করিয়া সে বলিল, 'কৌশল, ছল, বল,—একটা মেয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিষটি নিয়ে চিরদিনের জন্য তাকে নিঃস্ব করে দেওয়া—ইত্যাদি অনেক কথাই তুই বল্লি অরুণ—তার জবাব পরে দিচ্ছি। কিন্তু বলি, ভুল পথ তুই কাকে বলছিস?' জৈব ধর্ম্মের প্রয়োজন মেটাতে হলে অনেক কিছুই কর্তে হয়। এবং প্রতি মানুষই তা করে থাকে—তাকে ভুল বলা যায় না। মানে আমি বিবাহিত জীবনের কথা বলছি।'

প্রচণ্ড বিস্ময়ের সহিত তাহার মুখের পানে চাহিয়া মুহূর্ত্তের জন্য নির্বাক হইয়া গেলাম। ভাবিলাম, বলে কি! মুক্তকণ্ঠে উচ্ছৃঙ্খলতার জয়গান গাহিয়া অবাধ স্বেচ্ছাচারের সহিত সে বিবাহিত জীবনের তুলনা করিবার স্পর্দ্ধা কোথা হইতে পাইল? জৈব ধর্ম্মাচরণের স্বপক্ষে একাধিক নারীর দেহসম্ভোগ ইহার কাছে কোন অপরাধই নহে!

বলিলাম, 'সমাজ বলে একটা কিছু আছে তা মানিস ত?'

অসঙ্কোচে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না মানিনে। থাকলেও আমার উপর কর্তৃত্ব করার কোন ক্ষমতা নেই সে সমাজের।'

স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। চিরাচরিত বিধিনিষেধের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া যে মানুষ প্রচলিত সমাজব্যবস্থার মূলে আঘাত হানিতে চায় তাহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতেও ভয় পাইলাম। মনে হইল ইহার ভয়াবহ আবেষ্টনী হইতে যত শীঘ্র সম্ভব মুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যদিও সমাজের সর্বপ্রকার শাসনব্যবস্থা কোনদিন একান্ত ও অভ্রান্ত সত্য বলিয়া নিঃসংশয়ে

মানিয়া লইতে পারি নাই, তবুও নিজের শক্তির অতিরিক্ত কোন কাজ করিয়া নিজের অবিমৃষ্যকারিতার প্রমাণও দিই নাই কখনও। তেমন সাহসও ছিল না। ইংরাজ শাসনাধীন কংগ্রেসের মত আইন বাঁচাইয়া যতটুকু বিদ্রোহ করা চলে তাহার অতিরিক্ত কিছুই করি নাই কখনও। কিন্তু কেহ যে তেমন কিছু করিতে পারে বা কাহারও করিবার সাহস থাকিতে পারে' তাহাও ভাবিতে পারি নাই। এবং সে কথা ভাবিতে পারি নাই বলিয়াই সেদিন অনলের মুখে সমাজের বিরুদ্ধে এই দুঃসাহসিক বিদ্রোহের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। তাহার প্রত্যুত্তরে কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না

অনল বলিল, 'সমাজের খড়্গ চিরদিনই দুর্ব্বলের মাথা কেটেছে। সবলের কাছে তার কোন শক্তিই নেই।'

নিজের অজ্ঞাতসারেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

তাহা লক্ষ্য করিয়া অনল বলিল, 'আমার কথায় হয়ত তুই আঘাত পেলি অরুণ। কিন্তু তোকে আঘাত দেবার জন্য আমি কিছু বলিনি। আমি শুধু যা মিথ্যা, যা মূল্যহীন তাকেই অস্বীকার করি।'

চুপ করিয়া থাকাই আমার উচিত ছিল। কিন্তু পারিলাম না। বলিলাম, 'কিন্তু আমাদের সমাজব্যবস্থা যে আগাগোড়া মিথ্যা বা মূল্যহীন এটাও প্রমাণ হয়নি। তোর চেয়েও অনেক বুদ্ধিমান বা প্রতিভাশালী মানুষ জন্মে গেছেন; তাঁরাও আগাগোড়া মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেন নি একে।

বিদ্রূপাত্মক হাসি হাসিয়া বলিল, 'আমার চেয়ে বুদ্ধিমান বা প্রতিভাশালী মানুষ হয়ত জন্মেছে—কিন্তু আমার চেয়ে শক্তিশালী মানুষ নাও জন্মে থাকতে পারে ত?'

একথার প্রতিবাদ করা নিরর্থক ভাবিয়া বলিলাম 'অতখানি ঔদ্ধত্য বা অহংকার ভাল নয় অনল?'

কোন কথা না বলিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তারপর বলিল, 'আচ্ছা সে কথা নয় বাদ দিলাম। কিন্তু তুই যে বল্লি—ছলে বলে কৌশলে একটা মেয়ের সর্বস্ব অপহরণ করে তাকে চিরদিনের জন্য নিঃস্ব করে দিই। কেমন? কিন্তু যদি বলি ছল বল কৌশলের আশ্রয় আমি কখনও নিই নি। বিশ্বাস কর্বি?'

তাহার এই কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। যেহেতু বিশ্বাস না করার পক্ষে অনেক যুক্তি ছিল।

সে আমায় চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, 'আমি জানি তুই কথাটা বিশ্বাস কর্বি না, কিন্তু কথাটা সত্যি। তাছাড়া নিঃস্ব করে দেওয়া কথাটাই ভুল। নারীর সন্তান ধারণের ক্ষমতাই হল নারীর পরিচয় বা যৌবন। এবং সেটা কোন স্থাবর সম্পত্তি নয় যে চুরি করে লুকিয়ে ফেলা যাবে। যতদিন তাদের সন্তান ধারণের ক্ষমতা থাকে, ততদিনই তাদের মূল্য থাকে। অতএব নারীকে নিঃস্ব করা বলতে যা বল্লি তা অত সহজে সম্ভব নয়, বা সত্য নয়।'

বলিলাম, 'তোর কথাগুলো খুব ধারাল অস্ত্রের মত। সে সব অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা কর্তে গিয়ে কখন যে পরীক্ষকের সবকিছু খণ্ড বিখণ্ড করে দেয়, তা পরীক্ষক নিজেও জানতে পারে না।'

উত্তরে অনল বলিল, 'তুই মনে মনে চটেছিস অরুণ। না হলে এসব কথা বলতিস না। একটা মেয়েকে বঞ্চনা করবার কোন প্রয়োজনই আজ পর্যন্ত ঘটেনি। সত্যি বলছি, কাউকে প্রবঞ্চনা করেছি তার দেহটুকুর লোভে, নিজের মর্যাদায় আঘাত করে অপরাধীর মত নিঃশব্দে তাকে সম্ভোগ করেছি, এ যদি তুই ভেবে থাকিস্ তাহলে তা ভুল অরুণ।'

গভীর আন্তরিকতার সহিত কথাগুলি সে এমন করিয়া বলিল যে কথাগুলি অবিশ্বাস করিবার মত শক্তি রহিল না। তবুও যে সামান্য

সন্দেহটুকু ছিল সেইটুকু দূর করিবার জন্য বলিলাম, 'তুই কি বলতে চাস আজ পর্য্যন্ত সব মেয়েই তোকে স্বেচ্ছায় দেহ দান করেছে ?'

মাথা নাড়িয়া বলিল, 'সত্যিই তাই। আজ পর্যন্ত যত মেয়ের সঙ্গে মিশেছি তাদের কারুরই দেবার মত বস্তু দেহটা ছাড়া আর কিছু ছিল না। তাই তাদের সম্বন্ধে অযথা চিন্তা করিনি কখনও এবং...।'

বাধা দিয়া বলিলাম, 'কিন্তু মিনতি? তার প্রতি তোর আচরণ ত স্বাভাবিক নয়!'

নিজের হাতের আঙ্গুলগুলিকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল, 'ঐ ঘটনাটা ঠিক ওভাবে বিচার করা যায় না। মিনতির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়টা যে অশোভন তা হয়ত স্বীকার কর্ব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেও যে অন্যান্য মেয়ের মতই স্বেচ্ছায় দেহদান করেছে, এই কথাটা তোকে বিশ্বাস কর্তে বলি।'

বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই। কারণ আপনার যৌনজীবনের বিকৃতরূপ যে মানুষ অসঙ্কোচে উদ্ঘাটিত করিয়া অকপটে স্বীকার করে যে তাহার কৃতকার্যের স্বপক্ষে নিজের কোন যুক্তি বা অন্তরের সমর্থন নাই, তখন সেই সব কথা অবিশ্বাস করিবার মত কোন কারণ দেখি না। এবং সেই মানুষটিকে তাহার কৃতকার্যের জন্য তিরস্কার করিবারও কোন প্রয়োজন দেখি না। হয়ত জনসাধারণ আমায় দুর্বলচিত্ত বলিয়া অভিহিত করিবে, অথবা অনলের সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত দৌর্বল্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আমাকে তাহার মতবাদের সমর্থক বলিয়া মনে করিবে। করুক ক্ষতি নাই। প্রতিবাদ করিয়াও লাভ নাই। কারণ যে মানুষটির কথা বলিতে বসিয়াছি তাহার মানস-জীবনের গভীর অতৃপ্তি এবং অশান্তির পূর্ণ ইতিহাস আমি জানি। জগতের যে কোন পরিস্থিতির মধ্যে তাহাকে কিছুমাত্র বেমানান হইত না। তথাপি, সে যে কেন সাধারণের পথ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জীবনের শেষদিন

পর্যন্ত অপরিসীম অধ্যবসায়ের সহিত প্রচলিত বিধিনিষেধ, রীতিনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আত্মশক্তির অপব্যয় করিল, তাহার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া তাহাকে সর্বতোভাবে দোষী সাব্যস্ত করিলেও একটা কথা স্বতঃই মনে হয় যে, যাহাদের মধ্যে সে বাঁচিয়াছিল, তাহার জীবনের শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য তাহাদের অপরাধও কিছু কম নহে। স্বেচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক তাহার প্রবৃত্তির ভ্রান্ত পথ অবলম্বনের জন্য তাহার অন্তরস্থিত গোপন বেদনার ইতিহাস সাধারণ মানুষ জানে না। কিন্তু আমি জানি। আপনার অন্তরের কণ্ঠরোধ করিয়া বন্ধনমুক্ত প্রবৃত্তির দুর্ব্বার স্রোতের টানে যখন তাহার সর্ব্বস্ব নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন আত্মবিস্মৃতির গভীর লজ্জা এবং ব্যথা শুধু মাত্র অনমনীয় অহঙ্কার এবং প্রবল জেদের বশবর্তী হইয়াই কাহারও কাছে সে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে নাই। এবং পারে নাই বলিয়াই সংসারে সকলের কাছেই সে চিরদিন অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া রহিল।

একদিন বায়োলজির প্রাকট্যাকিল ক্লাস শেষ করিয়া আমি আর কালীধন চা পানের উদ্দেশ্যে কলেজের বাহিরে আসিতেছি, হঠাৎ চোখে পড়িল একটি সুবেশা সুন্দরী তরুণী একটি মোটর হইতে নামিয়া কলেজের অফিসঘরে প্রবেশ করিল। লুব্ধ মধুকরের মত গুঞ্জনমুখর তরুণের দল উৎসুক চিত্তে অফিসের দরজার কাছে অনাবশ্যক ভিড় করিয়া দাঁড়াইল এবং অকারণ উচ্চহাস্যে স্থানটিকে মুখরিত করিয়া তুলিল। আমি এবং কালীধন চলিয়া আসিতেছিলাম, হঠাৎ সেই অসংখ্য তরুণের কৌতূহলী লুব্ধ দৃষ্টির সম্মুখে তরুণীটি দ্রুত পদক্ষেপে আমার সামনে আসিয়া প্রশ্ন করিল, 'আপনি কোন ইয়ারে পড়েন?'

বলিলাম, 'ফার্ষ্ট ইয়ার সায়েন্স।'

জিজ্ঞাসা করিল, 'অনল মুখার্জ্জীকে চেনেন?'

উত্তর দিলাম, 'চিনি।'

'তিনি কোথায় আছেন বলতে পারেন ?'

বলিলাম, 'আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি ডেকে দিচ্ছি।'

বায়োলজির ডিসেক্সন হলে হাইবেঞ্চিতে বসিয়া একদল রসমুগ্ধ শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনল তখন বই বাজাইতে বাজাইতে অশ্লীল গান করিতেছিল। তরুণীটির আগমন সংবাদ শুনিয়া চমকিত হইয়া বলিল, 'এই মাটি করেছে। বেলা দত্ত বোধ হয়। তুই বলেছিস আমি আছি।'

বলিলাম, 'হ্যাঁ বলেছি বই কি।'

মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, 'উদ্ধার করেছিস। বলেদে আমি নেই—ছিলাম বেরিয়ে গেছি—'

বলিলাম, 'সে আমি পার্বনা।' কিন্তু তুই যাবি না কেন ?

উত্তর দিল, 'ওরা একটা থিয়েটার কর্বে, তার মহলা দেবে, আমায় যেতে হবে। আরও কটা মক্কেল জুটেছে—।'

হাসিয়া বলিলাম, 'মক্কেল কিরে ?'

তর্জনীর প্রান্তভাগ দিয়া তলপেটে খোঁচা মারিয়া বলিল, 'শালা মদ্না, মক্কেল বোঝ না ? মেয়ে—মেয়ে—। একপাল মেয়ে মিলে আমার শ্রাদ্ধ কর্বে।'

তাহার কথার ভঙ্গী শুনিয়া উপস্থিত সকলেই হাসিয়া উঠিল। একজন বলিয়া উঠিল, 'মালটি কে মাইরী ?'

অনল সহাস্যে জবাব দিল, 'গিয়ে দেখে আয় না।'

একজন ছুটিয়া গিয়া বারান্দা হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়া আসিয়া বলিল, 'উফ্, দুর্দ্দান্ত জিনিষ—'

ছোকরার কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলে সমস্বরে মাইরী বলিয়া পড়ি কি বাঁচি করিয়া ছুটিয়া সেই দুর্দ্দান্ত সামগ্রীটিকে দেখিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

অনলকে বলিলাম, "যা ভাই—আমি ভদ্রমহিলাকে বলে এলাম—ডেকে দিচ্ছি। তিনি নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ছেলের দল যা কর্ত্তে সুরু করেছে তাতে আমার নিজেরই লজ্জা কর্ছে।'

চোখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া অনল বলিল, 'এত্না দরদ্। বহৎ খারাপ।' ধমক দিয়া বলিলাম, 'ফাজলামী রেখে, আগে যা।'

জুতোটায় পা গলাইতে গলাইতে বলিল, 'শালা তোর জন্যে আমার এই কর্ম্মভোগ' বলিতে বলিতে জুতাটা পরিয়া বলিল, 'আয় আমার সঙ্গে—'

সশঙ্কিত চিত্তে বলিলাম, 'আমি কোথায় যাব?'

খপ্ করিয়া জামার বুকের কাছটা ধরিয়া বলিল, 'আয় না শালা'—বলিয়া আমাকে এক প্রকার জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

ঘর হইতে বাহির হইবার সময় যে ছেলেগুলি সেই দুর্দ্দান্ত জিনিষটি দেখিবার জন্য গিয়াছিল তাহাদের কয়েকজনের সঙ্গে দেখা।

একজন বলিল, 'অনল, মাইরী আমায় ভিড়িয়ে দেনা ভাই—' বলিয়া একটা অশ্লীল মন্তব্য করিল।

অশ্লীল মন্তব্য শোনা অভ্যাস আছে আমার। কারণ অনলের সর্ব্বক্ষণের সঙ্গী আমি। কিন্তু অনলের মুখে অশ্লীল মন্তব্য শুনিলে হাসি পায় আর তাহার মুখে অশ্লীল মন্তব্য শুনিয়া রাগ হইয়া গেল। ভাবিলাম, একি? একটি ভদ্রঘরের তরুণীর উদ্দেশ্যে অন্তরালে অশ্লীল মন্তব্য করার মত নীচতা একটি ভদ্রঘরের যুবকের পক্ষে কি করিয়া সম্ভব হয়? অনল কিন্তু কিছুমাত্র রাগ করিল না।

ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, 'চল না। ও আমায় বলেছিল ওদের গাড়ীর জন্য একটা ম্যাট্রিকুলেট ক্লিনার দরকার। গোটা ৬০৲ টাকা মাইনে পাবি, খেতে পর্তে পাবি। আর—'কথাটা শেষ করিল এমনি একটা মারাত্মক অশ্লীল কথা বলিয়া যে, যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া

বলিল তাহার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া গেল। এবং বাকী সকলেই 'bravo bravo' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। এমনকি আমিও না হাসিয়া পারিলাম না। এক একজন ছেলেটিকে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিল 'লে যা, অনলের সঙ্গে ইয়ার্কি মার্তে।' অনল হাসিতে হাসিতে নীচে নামিয়া আসিল।

তরুণীটি তখন সমবেত ছাত্রদের উৎসাহের প্রাবল্যে কিঞ্চিৎ অভিভূত হইয়া গাড়ীর কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। অনলকে তখনও লক্ষ্য করিয়া উঠিতে পারে নাই। অনল কিন্তু তাহাকে দেখিয়া বলিল, 'বল্লাম বেলা ও—আবার গাড়ীটা সঙ্গে নিয়ে এসেছে—।' বলিতে বলিতে আগাইয়া গিয়া সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, 'আরে বেলা! তুমি যে একেবারে হঠাৎ কলেজে চলে এলে?'

অনলকে দেখিয়া তরুণীটির সুন্দর মুখখানি যেন অপূর্ব্ব খুশীতে ভরিয়া উঠিল। বলিল, 'তোমায় যে পাব আমি আশা কর্তে পারিনি।'

কৃত্রিম ক্ষোভের সহিত অনল বলিল, 'তার মানে আমি কলেজ পালিয়ে বেড়াই বলতে চাও?'

বেশ অপূর্ব্ব ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, 'না, ভারী ভাল ছেলে তুমি,'

আমায় দেখাইয়া অনল বলিল, 'এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। এর নাম অরুণ ব্যানার্জ্জি, আমার বিশিষ্ট বন্ধু। আমাদের কলেজের সেরা ছাত্র—মানে ফার্ষ্ট ইয়ারে।'

বেলা হাত তুলিয়া আমায় একটা নমস্কার করিয়া বলিল, 'পরিচয় ওর অনেক আগেই পেয়েছি—শুধু নামটা জানা ছিল না।'

বেলার কথা শুনিয়া আমি যথেষ্ট বিস্মিত হইলাম। অনলও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার আমার মুখের পানে চাহিয়া লইয়া বলিল, 'তবে যে তুই বলিস্ তুই মেয়েদের সঙ্গে গায়পড়ে আলাপ কর্তে চাস্ না?'

কথাটা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম না সে রহস্য করিয়া বলিল কিনা।

কিন্তু প্রতিবাদ করিবার জন্য কিছু বলার পূর্বেই বেলা বলিল, 'উনি আমার সঙ্গে গায়পড়ে আলাপ করেন নি। বরং আমিই ওর সঙ্গে গায়পড়ে আলাপ করেছি, নাকি বলেন অরুণ বাবু?'

আমি আর কি বলিব? সস্মিত মুখে বলিলাম, 'না গায়েপড়ে আলাপ করার কি আছে? বলার মধ্যে অনলকে আমায় ডাকতে পাঠিয়েছেন।'

অনল বলিল, 'তুই কি ভাবিস এটা কম সৌভাগ্য?' বলিয়া চোখের ইঙ্গিতে কৌতুহলী ছাত্রের দলকে দেখাইয়া বলিল, 'এদের কাউকে কথাটা বল্লে এরা কৃতার্থ হয়ে যেত।'

বেলা অনলের কথা শুনিয়া আর হাসি গোপন করিতে পারিল না। বলিল, 'তা যা বলেছ।' 'এবং ঠিক সেই কারণেই আমি অরুণ বাবুকে পাকড়াও করেছিলাম।'

অবাক হইয়া বলিলাম, 'তার মানে?'

বেলা বলিল, 'আপনি আমায় দেখে যেভাবে মুখ ফিরিয়ে যাচ্ছিলেন তাতে মনে হল ইচ্ছা করেই হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক্, মেয়েদের দেখলে যে ছেলে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, তাদের কাছে মেয়েদের ভয়ের কোন কারণ নেই।'

অনল বলিল, 'আমি হলে কিন্তু কখনও মুখ ফিরিয়ে চলে যেতাম না, তিন লাফে সামনে এসে বলতাম, 'কাকে খুঁজছেন—তোমার—।'

তাহাকে থামাইয়া দিয়া বেলা বলিল, 'অসভ্যের চূড়ামণি তুমি; তুমি পার না এমন কাজই নেই।'

বলিলাম, 'তা যা বলেছেন বটে—'

অনল মুখ বিকৃত করিয়া আমার গলার স্বরের ব্যর্থ অনুকরণ করিয়া বলিল, 'এ ভারী আমার সমর্থক এলেন। তা যা না, পারিস্ ত যা না বেলার সঙ্গে—জান বেলা অরুণ একজন ভাল গাইয়ে।'

বেলা পুলকিত হইয়া বলিল, 'সত্যিই? তাহলে অরুণ বাবুকেও নিয়ে যেতে হয় আমাদের সঙ্গে!'

অনল তৎক্ষণাৎ তাহার কথাটা সমর্থন করিয়া বলিল, 'সেই জন্যইত নিয়ে এসেছি ওকে।'

অনলের কথা শুনিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিলাম। কারণ গান গাওয়া ত দূরের কথা। সা-রে-গা-মা শব্দগুলি পর্য্যন্ত আমি শুদ্ধ করিয়া উচ্চারণ করিতে পারি না। শুধু শুধু বিনয় প্রকাশ করিতেছি বলিয়া অনল আবার সন্দেহ প্রকাশ করে এই ভয়ে চুপ করিয়াই রহিলাম, এবং কি উপায়ে অনলের হাত হইতে আত্মরক্ষা করা যায় তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম।

অনল বোধহয় আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, 'ভয় নাই দুখানা গান কর্বি তাহলেই হবে।'

নিরুপায় হইয়া বলিলাম, 'কেন মিছিমিছি জ্বালাতন কর্ছিস্ অনল' বেলাকে বলিলাম, 'আমি সত্যিই গান জানি না—অনল শুধু শুধু—'

যা ভয় করিয়াছিলাম তাই। বেলা বলিল, 'আপনার মুখ দেখে বুঝতে পাচ্ছি আপনি গান জানেন। না বল্লে শুনছে কে?'

মুখ দেখিয়া যখন নিঃসংশয়ে গায়ক নির্বাচিত হইয়াছি তখন আর পরিত্রাণের কোন উপায় নাই জানিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলাম। সহসা মাথায় একটা মতলব আসিল। অনলকে বলিলাম, বইগুলি ক্লাসে রয়ে গেছে তুই গিয়ে নিয়ে আয়।

অনল সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, 'পাগল আরকি! আমি যাই বই আনতে আর তুমি এখান থেকে হাওয়া কাটো।

হাসিয়া বলিলাম, 'তাহলে চল দুজনে যাই, তাহলেত আর ভয় নেই।'

অনল বলিল, 'Not a bad idea, তাই চল।'

দুইজনে আবার ফিরিয়া গেলাম। কলেজের ভিতর ঢুকিয়া বলিলাম, 'আমায় এভাবে অপ্রস্তুত করে তোর কি লাভ হল ?'

সবিস্ময়ে বলিল, 'অপ্রস্তুত! অপ্রস্তুত কিসের ?'

বলিলাম, 'নয়ত কি ? আমি গান জানি ?'

সহসা যেন কথাটা মনে পড়িয়া গেল, বলিল, 'ওঃ তাই বল। কেউ তোকে গান কর্তে বলবে না, আমি রয়েছি ত সঙ্গে—আমায় নিয়েই সকলে এত ব্যস্ত থাকবে যে শেষ পর্যন্ত তোর হয়ত হিংসে হবে।'

কথাটা সে আমায় আঘাত করিবার জন্য বলে নাই ; মনের আবেগে অনাবিল সত্য কথাটাই বলিয়াছে। কিন্তু এমনই অদ্ভুত মানুষের মন যে, কয়েক মুহূর্ত্ত আগেই যখন বেলার কাছে অনল আমায় গান জানি বলিয়া বলিয়াছিল তখন মনে মনে সত্যই প্রমাদ গণিয়াছিলাম। এবং গান যে জানি না সেই কথা স্বীকার করিতে কোন লজ্জাবোধ করি নাই। কিন্তু যখন অনল অসঙ্কোচে বলিয়া বসিল যে সে থাকিতে আমায় কেহই গান গাহিতে অনুরোধ করিবে না, তখন মনের মধ্যে কিছুটা বেদনাবোধ না করিয়া পারিলাম না। ভাবিলাম সে বুঝি প্রকারান্তরে আমায় তাহার নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিয়া জানাইয়া দিল যে তাহার সহিত আমার তুলনাই হয় না। আমার এই মনোবৃত্তি হাস্যকর সন্দেহ নাই, কিন্তু এমন প্রায়ই ঘটে। নিজের কোন দৌর্ব্বল্য বা অক্ষমতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কোন মন্তব্যে মানুষ মাত্রেই কিছুটা আঘাত পায়—যেমন অন্ধকে অন্ধ বলিলে তাহার রাগ হয়। তাই অনলের কথা শুনিয়া বলিলাম, 'তাহলে আমার গিয়ে লাভ কি ?'

অনল বোধ করি আমার মনের ভাবটা বুঝিতে পারিল, বলিল, 'না—লাভ বিশেষ কিছু নেই। তবে দেখে আসবি মেয়েদের ব্যাপার

কি রকম হয়—তুইত মাঝে মাঝে মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিস। নিজের চোখে দেখে একটু অভিজ্ঞতা লাভ কর্বি আর কি?'

সত্যি কথা বলিতে কি, যাইবার ইচ্ছা আমার কিছুটা ছিল। কিন্তু অনলের কথা শুনিয়া প্রথমটা যেমন মনঃক্ষুন্ন হইয়াছিলাম, শেষের কথাগুলি শুনিয়া কেমন যেন ঝোঁক চাপিয়া গেল। বলিলাম, 'চল।'

অনল বলিল, 'বইটই নিয়ে যাবি নাকি?'

বলিলাম, 'তা নয়ত বই কোথায় রেখে যাব?'

জিহ্বা এবং তালুর সাহায্যে একটা শব্দ করিয়া বলিল, 'তুই একেবারে ছেলেমানুষ, বই রাখবার জায়গা নেই কলেজে?' বলিয়া তাহার প্রথম সঙ্গীদলের একজনকে ডাকিয়া বলিল, 'এই শালা বইগুলো আজ নিয়ে যাত' কাল কলেজে আনিস্।'

ছেলেটি বোধ করি বেলায় সংবাদ পাইয়াছিল। হাসিয়া বলিল, 'তুই কোথায় চল্লি মাইরী!'

প্রত্যুত্তরে বামচক্ষু মুদ্রিত করিয়া একটা অশ্লীল উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়া অনল বলিল, 'বুঝিস্ ত সবই।'

ছেলেটার বোধ করি ঈর্ষা হইতেছিল, বলিল, 'বেড়ে আছিস্ তুই।'

অনল বলিল, 'তব্বে—!' বলিয়া আমায় লইয়া গাড়ীর কাছে ফিরিয়া আসিল। বেলাকে বলিল, 'চল।' তিনজনে গাড়ীতে উঠিলাম, গাড়ী ছাড়িয়া দিল—।

মানুষের জীবনে এমনও ঘটনা ঘটে, যেগুলির মূল্য ঘটনা হিসাবে নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর হইলেও, পরবর্তী জীবনে সেইগুলির প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করা যায়। অনলের সঙ্গে বেলাদত্তদের থিয়েটারের মহলায় যাওয়া ঘটনাটিও ঠিক তেমনি ঘটনা। বেলা দত্তের বাড়ীতে থিয়েটারের মহলার বন্দোবস্ত হইয়াছে। দক্ষিণ কলিকাতার একটি খ্যাতনামা রাস্তার উপরে বেলাদের মনোরম বাড়ীখানি বেলার পিতার অর্থসঙ্গতির

পরিচায়ক। জনা ১৪।১৫ মেয়ে জড় হইয়াছে, বয়েস সতের হইতে বাইশ পর্যন্ত। ছিমছাম চেহারা, কায়দাদুরস্ত পোষাকপরিচ্ছদ, আচার আচরণে আধুনিকার সুস্পষ্ট ছাপ। ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে একটু শঙ্কিত হইলাম। শ্রীকৃষ্ণের রাধালীলার দ্বিতীয় সংস্করণ আর কি! গাড়ী থামিতেই একদল মেয়ে স্বভাবসুলভ কলধ্বনি করিয়া গাড়ীটাকে ঘিরিয়া ধরিল। এবং আমায় দেখিয়া কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া তেমনি চেঁচামেচি করিয়া এক সঙ্গে এত কথা বলিতে লাগিল যে শ্রবণ-শক্তি লোপ পাইবার উপক্রম হইল। একজন অনলকে দেখিয়া বলিল, 'যাক্ এসেছ তাহলে। আমরা ভাবলাম বুঝি আসবে না।' আরেকজন গৃহপালিত মার্জ্জারীর মত অদ্ভুত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'বেলা যখন গেছে তখন কি আর না এসে পারে?' একজন বলিল, '**You are too late Anal**, আরও আগে আসা উচিত ছিল।'

অনল নিতান্ত ভালমানুষের মত মুখ করিয়া আমায় দেখাইয়া বলিল, 'এর জন্যে দেরী হয়ে গেল।'

আবার মনে মনে প্রমাদ গণিলাম। না জানি কি মতলব ফাঁদিয়াছে!

একজন বলিল, 'একেত চিনলাম না অনল?'

অনল তাহার কণ্ঠস্বরের বিকৃত অনুকরণ করিয়া বলিল, 'চিনবে কি করে? লেখাপড়াও করনা, বাইরের কোন খবরও রাখ না। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নামকরা ছাত্র; এবং অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে গজল এবং খেয়ালে ফার্ষ্ট হয়েছেন।'

সমবেত সকলে একযোগে বলিয়া উঠিল, 'সত্যি!'

কে একজন বলিল, 'ভদ্রলোকের নাম কি অনল?'

অনল বলিল, 'ভদ্রলোকের নাম ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা কর্লেই জানতে পার্বে; আমি ত আর ঘটকালি কর্তে আসিনি।'

আমি তখন মনে মনে ইষ্টনাম স্মরণ করিতেছি। সৌভাগ্যক্রমে

মেয়েগুলির মধ্যে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার মত দুঃসাহস কাহারও হইল না। তাই তখনকার মত বাচিয়া গেলাম।

অনল বলিল, 'একা তোমাদের manage কর্তে পার্ব না, তাই একে সঙ্গে নিয়ে এলাম।'

মেয়েদের মধ্যে একটা হাসির সাড়া পড়িয়া গেল। ঠিক যে কি কারণে হাসিল বুঝিলাম না। তবে মনে হইল তাহাদের মনোভাবটা যেন এইরূপ যে এই নগন্য বালখিল্যটা আবার তাহাদের manage করিবে কি? অবশ্য মনের ভাব বুঝিবার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি আমার ছিল না, তবুও মনে হইল যদি নিতান্ত দয়া করিয়াও এ যাত্রা আমায় নিস্কৃতি দেয় তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই।

অনলকে ধন্যবাদ, সে তাহার কথার মর্যাদা রাখিয়াছিল অর্থাৎ আমায় আর গান করিতে হয় নাই। আমার স্থান অনলই পূর্ণ করিয়াছিল। এবং অনল যে বলিয়াছিল তাহাকে লইয়া মেয়েরা এত ব্যস্ত থাকিবে যে আমারই হয়ত হিংসা হইবে, কথাটা সে মিথ্যা বলে নাই। তাহাকে লইয়া মেয়ের দল সত্যই এত বেশী মাতিয়া উঠিল যে আমার অস্তিত্বটুকুও বোধকরি তাহারা ভুলিয়া গেল। একজন যুবকের পক্ষে এমন অবস্থা খুবই ক্ষোভের, তবুও আমার পক্ষে তাহা মঙ্গলজনকই হইয়াছিল। কারণ ঐ সময়টুকুর মধ্যে অনলকে লক্ষ্য করিবার কিছুটা সুযোগ পাইয়াছিলাম।

বেলার বাবা ব্যবসায়ী মানুষ। ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের সময়ে কি এক অভিনব কৌশলে লোহার কারবার করিয়া ব্যাংকের সঞ্চয়টাকে অবিশ্বাস্য রকমের মোটা করিয়া তুলিয়াছেন। সন্তান বলিতে মাত্র দুইটি—বেলা এবং তাহার অপেক্ষা কয়েক বছরের ছোট একটি ছেলে। নিভাননী বেলার মা। বাংলার পল্লী অঞ্চলের অশিক্ষিতা মধ্যবিত্ত ঘরের নারী। চেহারার মধ্যে নূতনত্ব কিছু ছিল না। কিন্তু বর্তমান যুগে

নানাবিধ প্রসাধনের উপায় উদ্ভাবিত হওয়াতে চল্লিশ বৎসর বয়সেও তাহার চেহারার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক জৌলুস আসিয়াছে। চলাফিরা পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যে বিগত যৌবনের মাধুর্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা আমার চোখে অত্যন্ত অশ্লীল এবং অশোভন বলিয়া বোধ হইল। তিনি আসিয়া অনলকে দেখিয়া তাহার পিতামাতা হইতে অনলের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক কুশল প্রশ্নের পর, সামান্য দুইচারিটা কথার দ্বারা আমার পরিচয় লইয়া হাস্যকর অঙ্গভঙ্গী করিয়া চলিয়া গেলেন। অনলও দেখিলাম মাসীমা বলিতে আনন্দে গদগদ হইয়া উঠিল। এবং তিনি চলিয়া গেলে সমবেত মেয়েদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমার কাছে আসিয়া কানে কানে নিভাননীর সম্বন্ধে এমন মারাত্মক রসিকতা করিল যে লজ্জায় আমার মুখ চোখ লাল হইয়া গেল। অনলের এই স্বভাবটা চিরদিন অপরিবর্তিত রহিয়াই গেল। অর্থাৎ মানুষের আচার আচরণ লইয়া অশ্লীল রসিকতা করার স্বভাবটা। অবশ্য নিভাননীর আচরণ আমার চোখেও দৃষ্টিকটু ঠেকিয়াছিল, কিন্তু তাহা লইয়া যে অনল একটা জঘন্য রসিকতা করিতে পারে তাহা ধারণা করি নাই। নিভাননী চলিয়া যাইবার পর অনলের মুখের এই রসিকতা শুনিয়া চলিয়া আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। সত্য কথা বলিতে কি উপস্থিত মেয়েদের আচার আচরণও আমার নেহাৎ ভাল লাগে নাই। কেবলই মনে হইতে লাগিল যে ইহাদের স্বযত্নভূষিত আবরণ এবং আভরণের নিম্নবর্তী দেহের গোপনতম অংশ এবং রহস্যগুলি, মেয়েগুলির কথাবার্তার মধ্যদিয়া অথবা চটুল চাহনি এবং দেহের বিশ্রী অঙ্গভঙ্গীদ্বারা, বড়বেশী নগ্নভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের চাপা হাসি ও টুকরা টুকরা কথার ফাঁকে ফাঁকে তাহাদের যে পরিচয় পাইতেছিলাম সেই সুরের অর্থ সম্পূর্ণ না বুঝিলেও, এইটুকু বুঝিতে পারিতেছিলাম যে তাহাদের কথাবার্তার মধ্যে শ্রুতিমধুর শব্দ, ভাষা বা ভাব কিছুই ছিল

না। তাহাদের অকারণ উচ্চহাস্য, অহেতুক উচ্চকণ্ঠের কথাবার্তা যেন ঘরের আবহাওয়াটা পর্যন্ত দূষিত করিয়া তুলিল। বিশেষতঃ নাচের মহলা দিবার সময় তাহাদের অশোভন অঙ্গভঙ্গী এবং সচেষ্ট ঔদাসীন্য যেন তাহাদের অন্তরস্থিত সুপ্ত বুভুক্ষার কুৎসিত মূর্তিটিকে নিতান্ত লজ্জাহীনার মত আমাদের সামনে প্রকাশ করিয়া দিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত কি হইত ঠিক জানি না। বস্তুতঃ ঐ অবস্থার মধ্যে নিজের অসহায় অবস্থার গুরুত্ব নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিয়া গভীর বিতৃষ্ণার সহিত ব্যস্ত হইয়া স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছিলাম।

সহসা একটি মেয়ে ঘরে প্রবেশ করিল। মেয়েটির বয়স ২১।২২ বৎসর হইবে। ঈষৎ কৃশ চেহারা ; রঙ্‌ যে ফর্সা নহে তাহা প্রতিবাদের আশঙ্কা না করিয়া নিঃসংশয়ে বলা চলে। চেহারার মধ্যে কোথাও কোন অসামান্যতা নাই। নেহাৎ সাধারণ পাঁচজন বাঙালী তরুণীর মত মাধুর্যবিহীন শুষ্ক চেহারা। দেখিলেই বুঝা যায় তাহার বিবাহের সময় ঔদার্য এবং তাহার ব্যক্তিগত সৌভাগ্য ব্যতীত বিবাহের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। কিন্তু অদ্ভুত তাহার চোখ দুইটি। সোনালী ফ্রেমের চশমার তলায় দুটি শান্ত স্থির চোখের শান্ত স্নিগ্ধ করুণ চাহনি, স্বতঃই ভারবাহী পশুর বেদনা নিপীড়িত অসহায় চাহনির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সমবেত প্রগতিশীলাদের স্বজাতি এবং স্বগোত্রীয় জীব হইয়াও সে প্রগতির ধারাটাকে এখনও সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনিতে পারে নাই, তাহা তাহার কুণ্ঠিত পদক্ষেপ দেখিয়াই বুঝা যায়। তাহার সংকোচজড়িত লজ্জিত পদক্ষেপ এবং ভীত চাহনি দেখিয়া হাসি পাইল। ভাবিলাম বলি, যাহার যে বস্তু সহ্য হয় না, তাহার সে বস্তু হইতে দূরে সরিয়া থাকাই মঙ্গল। কিন্তু মুখে কিছু না বলিয়া শুধু নীরবে তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

মেয়েটি ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সঙ্গিনীদের ইঙ্গিত পূর্ণ

কথাবার্তা শুনিয়া বুঝিলাম যে নবাগতাটিই তাহাদের বিদ্রূপের সামগ্রী। একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল, 'শিখা এসেছিস্ ভাই ; আমরা ভাবলাম তুই বুঝি আর আসবিই না।'

অপর একজন তরল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'তুই বড় বাজে বকিস্ রেবা। অনল এসেছে আর শিখা না এসে পারে ?'

কথাটা শুনিয়া সকলেই উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। নীরব রহিলাম শুধু আমি। কারণ কিছু বলিবার ক্ষমতা আমার ছিল না।

অনল বলিল, 'সে দোষটা আর ওকে একা দিচ্ছ কেন ? তোমরাও কেউ বাদ যাওনা।'

রেবা তর্জ্জন করিয়া উঠিল, 'ইস্ তাই বইকি !'

অনল হাসিতে লাগিল। লক্ষ্য করিলাম অনল সমবেত সকলকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতেছিল, কিন্তু শিখার উদ্দেশ্যে কথা বলিবার সময় কিঞ্চিৎ সম্ভ্রম সহকারেই কথা বলিল।

একটি মেয়ে নাম মালতী সেন, বলিল, 'শিখাত আসবেইনা বলেছিল, তবে এল কেন শুনি ?'

অনল অর্গান বাজাইতে বাজাইতে বলিল, 'বাঃ, বিনা পয়সায় শিক্ষিত বাঁদরের নাচ দেখতে পেলে কে আর না আসে ?'

চোখ পাকাইয়া মালতী অনলের কানটা ধরিয়া বলিল, 'কি আমরা বাঁদর !'

প্রত্যুত্তরে অনল ঝাঁকানি দিয়া মাথাটা সরাইয়া লইয়া বলিল, 'আঃ মালতী, তোমায় কতদিন না বলেছি তুমি আমার অত কাছে এস না। কোনদিন কি অসভ্যতা করে ফেলব তার ঠিক নেই।'

ঘরময় একটা হাসির লহরী খেলিয়া গেল। মালতী চকিতে দুই হাত সরিয়া গিয়া, দুই চোখে বিদ্যুৎ বর্ষণ করিয়া কৃত্রিম তর্জ্জন সহকারে বলিল, 'চাষা কোথাকার !'

অন্যান্য মেয়েদের মধ্যে কেহ বলিল, 'কি অসভ্য ভাই—'। কেহ বলিল, 'তোমার কথার কি কোন বাঁধন নেই অনল?'

অনল নিরুত্তরে হাসিতে লাগিল। শিখার মুখের ভাবে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। সে কাহারও কোন বিদ্রূপের জবাব না দিয়া সঙ্গিনীদের দল হইতে অনতিদূরে একটা সোফায় বসিয়া পড়িল। নাচের মহলা যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিতে লাগিল। শুধু নাচের ফাঁকে ফাঁকে অনল এবং তাহার সঙ্গিনীদের মধ্যে সময়বিশেষে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হইতে লাগিল।

শিখার পুরোনাম শিখারাণী বোস। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মেয়ে। বয়স প্রায় ২১।২২ বছর হইবে। মুখে সামান্য মাধুর্য থাকিলেও রং কালো বলিয়া সে মাধুর্য বিশেষ চোখে পড়ে না। শতকরা নিরানব্বইটি বাঙালী ছেলেমেয়ের মত বয়সের তুলনায় চেহারার গঠন দুর্ব্বল। পিতার অর্থসঙ্গতি নেহাৎ ভাল নয় বলিয়াই এখনও তাহার বিবাহ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। তাহার উপর তাহার রূপহীন দেহটা দেখিয়া সাধারণ পাঁচজন মানুষ দূর হইতেই ফিরিয়া যায়। অতএব যাচাই করিবার মত উদার খরিদ্দারও পাওয়া যায় নাই। কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে পিতার দুর্ভাবনা মাত্রা ছাড়াইবার উপক্রম হইতেই বিচক্ষণ পিতা তাহাকে স্কুলের গণ্ডী পার করাইয়া কলেজে দিয়াছিলেন। উদ্দেশ্যও ছিল খুবই সাধু। এবং রূপে লক্ষ্মী না হইলেও, গুণের দিক দিয়া শিখা সরস্বতীর কাছে নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিত। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সসম্মানে পাশ করিয়া অর্থাৎ প্রথম বিশজনের মধ্যে স্থান লাভ করিয়া সে স্কুলে এবং বাড়ীতে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। ফলে কলেজে ভর্ত্তি হইবার সময় বিনা খরচে পড়িবার উপায় খুবই সহজ হইয়া গিয়াছিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল বি. এ. পাশ করিয়া সে নিজের জীবিকা অর্জ্জনের পথ বাছিয়া লইবে। এবং সেই উদ্দেশ্যেই সে আপনার পাঠ্য পুস্তকের

মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছিল। সঙ্গীসাথী তাহার বিশেষ কেহ ছিল না। কারণ তাহার রূপহীনতার দুঃখ তাহার কুমারী হৃদয়ে যে হীনমন্যতা জাগাইয়া তুলিয়াছিল তাহার জের কাটাইয়া আলাপ পরিচয় করিতে সে সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিত। তাহার উপর পরিবারের অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হয় নাই। এবং একমাত্র সেই কারণেই তাহার বেশভূষা আচার ব্যবহারে কোনদিনও আতিশয্য পরিলক্ষিত হয় নাই। তাহার বান্ধবীদের আহুত অধিকাংশ আনন্দোৎসবেই সে নানা অছিলায় অনুপস্থিত থাকিত। বান্ধবীরা যে তাহা বুঝিত না, তাহা নহে। তবুও তাহাকে প্রতিবারেই আমন্ত্রণ জানাইত। এমনি কি একটা উৎসব উপলক্ষ্যে বেলা দত্তের বাড়ীতে বেলা অনলের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল। পরিচয় বলিলে অত্যুক্তি করা হয়। বস্তুতঃ অনল তাহার স্বভাবসুলভ চাপল্যের বশবর্ত্তী হইয়াই শিখাকে তাহার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া, শত শত প্রশ্ন করিয়া বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। শিখা স্বভাবতঃই গম্ভীর প্রকৃতির। কলেজে বহু ছাত্রের মধ্যে থাকিয়াও সে তাহার সঙ্গিনীদের মত অপরিচিত যুবকের সহিত অসঙ্কোচে কথাবার্তা বলিবার বা মেলামেশা করিবার কৌশলটুকু আয়ত্ত করিতে পারে নাই। এইজন্য ক্লাশের ছাত্রদের কাছেও সে বিদ্রূপের পাত্রী ছিল। এবং সময় বিশেষে তাহাদের কঠিন বিদ্রূপ শিখা নীরবেই সহ্য করিয়া যাইত। অবশ্য ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। সহজলভ্য বস্তুর প্রতি মানুষের যেমন কোন শ্রদ্ধা বা মূল্য থাকে না, ঠিক তেমনই কোন দুর্লভ বস্তুকে হস্তগত করিবার অক্ষমতা স্বভাবতঃই মানুষের মনে সেই বস্তুটির প্রতি বিদ্রূপের উদ্রেক করে। শিখার রূপহীনতার প্রতি নিষ্ঠুর ইঙ্গিত করিয়া তীব্র ব্যঙ্গে সময়ে সময়ে তাহার আয়ত চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে। কিন্তু কোনদিনই সে প্রতিবাদ করে নাই। সহপাঠীদের ব্যঙ্গ এবং বিদ্রূপ যখন

অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে ঠিক সেই সময়েই অনলের সহিত তাহার আলাপ। পুরুষ সম্বন্ধে কোন দৌর্ব্বল্য সৃষ্টি হইবার পূর্বেই শিখার মনে পুরুষ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধ মনোভাব জন্মিয়াছিল। কিন্তু অনল যখন উপযাচক হইয়া আলাপ করিতে আসিল তখন শিখা যতখানি বিস্মিত হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা বেশী হইয়াছিল কুণ্ঠিত !

প্রথম পরিচয়ের দিনে বেলাদের বাড়ীর হলঘরে গানের আসর বসিয়াছিল। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এবং করতালির মধ্যে অনলের প্রথম গানখানি শেষ হইলে শিখা নিঃশব্দে সকলের অলক্ষ্যে আসর হইতে উঠিয়া বেলার পড়িবার ঘরে গিয়া একখানি ইংরাজী উপন্যাস লইয়া পড়িতে লাগিল। চলিয়া আসিবার সময় সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই যে অনলের দৃষ্টি নিঃশব্দে তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে। অনলের গান শেষ হইলে, বেলার নাচ সুরু হইতেই অনল চুপি চুপি উঠিয়া আসিয়া সোজা বেলার পড়ার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। শিখা তখন তন্ময় হইয়া ইংরাজী উপন্যাস পড়িতেছিল। সহসা অনলের কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া বইটি বন্ধ করিয়া শোফা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অনল হাসিয়া বলিল, 'বসুন বসুন। দাঁড়াবার দরকার নেই—।'

শিখা বসিল না। তেমনি করিয়াই বইখানি দুই হাতে ধরিয়া নত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

অনল বলিল, 'আপনি হঠাৎ উঠে এলেন যে—'

শিখা নিরুত্তর।

অনল বলিল, 'আমার গান বুঝি ভাল লাগল না ?'

শিখা এবারও কোন কথা বলিতে পারিল না, একটা দুরন্ত সঙ্কোচ তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল।

অনল বলিল, 'আপনি নিশ্চয়ই রাগ করেছেন। ভাবছেন আমি কি অভদ্র ; বলা নেই, কওয়া নেই ফস্ করে ঘরে ঢুকে পড়লাম।

কিন্তু সত্যি বলছি আপনি যখন উঠে এলেন, তখন কেন জানি না মনে হল আপনার কি যেন একটা হয়েছে, আপনি—।'

শিখা বোধকরি এতক্ষণ মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'আমার কিছু হয়নি!'

অনল বলিল, 'তা ভাল। আমি ভাবলাম আমার গান বুঝি ভাল লাগল না আপনার।'

শিখা এবার তাহার আয়ত দুই চক্ষু অনলের মুখের উপর মেলিয়া ধরিয়া ধীর কণ্ঠে বলিল, 'আপনি বড় বেশী বিনয় প্রকাশ কর্চ্ছেন অনলবাবু! না হলে আপনি বেশ জানেন আপনার গান খারাপ লাগতেই পারে না।'

অনল সপ্রতিভ ভাবেই বলিল, 'না খারাপ যে লাগতেই পারে না, এমন কথাটা বলতে পারি না। ব্যক্তিবিশেষের কাছে খারাপ লাগতেও ত পারে।'

শিখা হাসিয়া বলিল, 'না পারে না। ভাল জিনিষ সকলেরই ভাল লাগে।'

অনল বলিল, 'আপনার কথার প্রতিবাদ কর্ত্তে পারা যায়! কিন্তু সেটা আজ আর কর্ব না।'

শিখা বলিল, 'কেন জানতে পারি কি?'

অনল বলিল, 'কারণ আর কিছুই নয়; আপনার সঙ্গে আজ আমার প্রথম পরিচয় হল। নীরস তর্কের অবতারণা করে সে পরিচয়ের মাধুর্য্যটুকু নষ্ট কর্ত্তে চাই না। ও কথা যাক্—একা বসে বসে কি পড়ছিলেন?'

শিখা বলিল, 'Hardyর Far From The Madding Crowd.'

অনল কৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত বলিল, 'সর্বনাশ, এই ভয়াবহ crowd এর মধ্যে বসে আপনি Far From Madding Crowd পড়ছেন?

আপনার বান্ধবীরা জানতে পার্লে আপনার কি দুর্দ্দশা হবে জানেন ?'

শিখা স্মিত মুখে বলিল, 'জানি। কিন্তু আপনি না বল্লে তারা জানতে পার্বে না।'

অনল বলিল, 'আমি যদি বলে দিই ?'

ছেলেমানুষের মত শিখা বলিল, 'তা আপনি কক্ষণও পার্বেন না।'

'পার্বনা কেন ?'

'কারণ তাহলে আপনিও যে সময়বিশেষে Madding Crowd এর সঙ্গ এড়াতে চান সেটাও তারা বুঝে নেবে।'

অনল দুই হাতের একটা ভঙ্গী করিয়া বলিল, 'সেটা তারা জানে। এবং—'

অনলের কথা শেষ না হইতেই বেলা এবং আরও একটি মেয়ে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল এবং অনল ও শিখাকে কয়েক হাত ব্যবধানের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অকারণে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

বেলা বলিল, 'ও মাগো! তুমি কি সাংঘাতিক ছেলে অনল! তোমার চলে আসার ধরণটা দেখেই বুঝেছি তুমি কি একটা মতলবে উঠে এসেছ। তখনই মলিনাকে বলছিলাম—'বলিয়া সঙ্গের মেয়েটির দিকে ফিরিয়া বলিল, 'হ্যাঁরে বলিনি আমি।'

মলিনা অকারণে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, 'হ্যাঁ বলেছিলি।'

অনল নির্ব্বিকার চিত্তে শিখাকে বলিল, 'কেমন দেখলেনত, আমি যা বলেছি, তা ঠিক কি না। আপনার সঙ্গিনীরা ঠিক বুঝতে পেরেছে আমি কেন উঠে এসেছি।'

শিখা কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার নারীচিত্ত সহজেই বুঝিয়া লইয়াছে নির্জ্জন ঘরে অনলের সহিত তাহার উপস্থিতি তাহার সঙ্গিনীদের মনে একটা সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছে। অনলের সম্বন্ধে শিখার কোন কথাই জানা ছিল না। তবুও সঙ্গিনীদের

আকস্মিক আগমনে সে এমনই আড়ষ্ট হইয়া পড়িল যে শতচেষ্টায়ও তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। এবং তাহার এই আড়ষ্ট ভাব দেখিয়া বেলা এবং মলিনা পরস্পরের পানে চাহিয়া সহসা দুইজনেই হাসিয়া ফেলিল। মলিনা বলিল, 'চলরে বেলা, বেচারীদের disturb করে লাভ নেই। Carry on অনল'—বলিয়া দুইজনেই বিলোল কটাক্ষ হানিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তাহারা চলিয়া যাইতেই অনল সক্ষোভে বলিয়া উঠিল, 'Scoundrels !'

তাহার কণ্ঠস্বরে কাঠিন্যের আভাস পাইয়া শিখা চকিত হইয়া বলিল, 'কাকে গালাগাল দিলেন ?'

অনলও কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল যে কথাটা বলা তাহার ভুল হইয়া গিয়াছে। তাই সামলাইয়া লইবার জন্য বলিল, 'নাঃ ও কিছুনা—কাকে আর ?'

শিখা কিন্তু তেমনিভাবেই বলিল, 'ওরা কি ভাবল বলুন ত ?'

অনল একাগ্রদৃষ্টিতে শিখাকে লক্ষ্য করিতেছিল। সহসা শিখার প্রশ্ন কানে যাইতেই বলিল, 'কি যে ভাবল, তা আর না শোনাই ভাল।'

শিখার নারীচিত্ত স্বাভাবিক মালিন্যের ইঙ্গিত পাইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, 'কিন্তু তাই বলে একটা মিথ্যা ধারণা দিয়ে—'

বাধা দিয়া অনল বলিল, 'আগাগোড়া যে মিথ্যা নয়।'

শিখা বিস্মিত কণ্ঠে বলিল, 'তার মানে ?'

অনল তাহার মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত দিয়া পাশের শোফাটায় আঘাত করিতে করিতে বলিল, 'তার মানে আপনার সঙ্গিনীরা জানে মেয়েদের সম্বন্ধে আমার দুর্বলতার অন্ত নেই।'

শিখা কথাটার অন্তর্নিহিত গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া নিজের অজ্ঞাতেই শিহরিয়া উঠিল। বলিল, 'কথাটার তাৎপর্য ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

অনল হাসিয়া বলিল, 'কথাটার মানে একদিন নিজেই বুঝতে

পার্বেন ; এখন চলুন ; ওরা সবাই মিলে অযথা অসম্ভব চিন্তা কর্ছে আমাদের দুজনের সম্বন্ধে।'

শিখা প্রশ্ন করিল, 'কি করে জানলেন ?'

চলিয়া আসিতে আসিতে অনল বলিল, 'মেয়েদের যেটুকু বুঝেছি তাতে ওকথাটা বুঝতে আমার কিছু মাত্র কষ্ট হয় না।'

অনল দরজার কাছে আসিয়া দরজা খুলিবার উপক্রম করিতেই শিখা বলিল, 'শুনুন।'

অনল ফিরিয়া দাঁড়াইল। শিখা আগাইয়া আসিয়া অনলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, 'দেখুন অনল বাবু ; আপনি কথা প্রসঙ্গে আপনার নিজের সম্বন্ধে একটা ইঙ্গিত করেছেন, তার সত্যাসত্য সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই ; এবং আমার বান্ধবীদের সম্বন্ধে যে কথাগুলি বল্লেন মেয়েমানুষ হয়ে সে কথার অর্থ আমি বুঝতে পারি। কিন্তু—'

সহসা শিখা থামিয়া গেল। অনল একাগ্রচিত্তে তাহার কথাগুলি শুনিতেছিল। শিখা নীরব হইতেই অনল বলিল, 'থামলেন কেন বলুন ?'

শিখা ধীরস্বরে বলিল, 'না আজ থাক্। শুধু এই কথাই আমি আমার বান্ধবীদের জানিয়ে দেব যে তারা ভুল করেছে।'

অনল বলিল, 'সে কথা যদি তাদের বোঝাতে যান, তাহলে আপনিও ভুল কর্বেন।'

শিখা বিস্মিত হইয়া বলিল, 'কেন ?'

অনল সে কথার কোন জবাব না দিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

অনল হলঘরে আসিয়া পৌছিতেই সমবেত মেয়েগুলি কলরব করিয়া উঠিল। অনল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সকলকে দেখিয়া লইয়া পিয়ানোর টুলটা টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিল, 'তারপর ?'

কয়েকজন প্রগলভা মেয়ে বলিয়া উঠিল, 'তারপরের কথাটা তোমার কাছ থেকেই জানতে চাই অনল?'

বাকী মেয়েগুলি সমস্বরে হাসিয়া উঠিল। নাটকীয় ভঙ্গীতে হাত তুলিয়া সকলকে থামাইয়া দিয়া অনল বলিল, 'Dont be· jealous—আমি এমন কিছুই করিনি। একদিন তোমাদের অনেককে নিয়ে যে নাটক অভিনয় করেছি, আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বরং তোমাদের মধ্যে দু'একটা অর্বাচীনের আকস্মিক হস্তক্ষেপে অসমাপ্ত নাটকের মধ্যভাগে বাধ্য হয়েই আমায় যবনিকা পাত কর্তে হয়েছে।'

অনলের কথায় এবারও মেয়েগুলি হাসিয়া উঠিল। কিন্তু সে হাসিতে যেন আর প্রাণ রহিল না। উপরন্তু অনলের কথাগুলির অন্তর্নিহিত কঠিন সত্যের আভাস পাইয়া অধিকাংশের মুখই লজ্জায় বিবর্ণ হইয়া গেল। শিখা আসিয়া নিঃশব্দে সকলের পিছনে দাঁড়াইল। মেয়েদের কেহই তাহা দেখে নাই।

একজন বলিল, 'তবুও, ভাল—মাঝপথেই যবনিকা পাত করেছ অনল—আমরা ভাবছিলাম বুঝি—'

অনল বাধা দিয়া বলিল, 'সকলকে নিজের মাপে বিচার করো না।'

মেয়েটি কঠিন প্রত্যুত্তর পাইয়া বোকার মত হাসিতে লাগিল।

আরেকজন বলিল, 'ভগবান যা করেন, ভালর জন্যই। এতদিন আমরা শুধু অনলকেই দেখে এসেছি, এবার থেকে তার শিখাও দেখতে পাব।'

আবার সকলে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। সকলেই ভাবিল অনলকে বুঝি খুব স্পষ্ট কথা বলা গিয়াছে। কিন্তু অনল তৎক্ষণাৎ সপ্রতিভ ও তীক্ষ্ণ প্রত্যুত্তর করিল 'কথাটায় হাসির কি আছে? অনলের শিখাই থাকে, অনলের কখনও ছায়া থাকে না।'

যে মেয়েটি কথাটি বলিয়াছিল তাহার নাম ছায়া। মেয়েটি একদিন

অনলের প্রিয়পাত্রী ছিল। অনলের স্বভাব-সুলভ দাহিকা শক্তির তীব্রদাহনে ছায়ার কুমারী জীবনের মধুর সম্পদ অকালেই দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এবং দগ্ধমহীরহের মত প্রয়োজনহীন ছায়ার মূল্য অনলের কাছে আজ কিছুই নহে। তাই অনলের কথায় ছায়ার বিগত জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকু ক্ষণিকের জন্য স্মরণ করাইয়া দিতেই, ছায়া বেদনা-পাণ্ডুর মুখে অনলের পানে চাহিয়া রহিল। উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া মেয়েরা নিজেদের মধ্যে কি যেন আলোচনা করিতে লাগিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া অনল বলিল, 'কি হল? আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর্ছ নাকি তোমরা?'

মেয়েদের মধ্যে অতি আধুনিকা বলিয়া দীপ্তিসেনের সুনাম ছিল। সে বলিল, 'আচ্ছা অনল, তুমি আর কতদিন এরকম মৌমাছির মত উড়ে বেড়াবে বলত?'

অনল তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, 'যতদিন তোমাদের মধ্যে মধুর আস্বাদ পাব।"

দীপ্তি বলিল, 'Don't be vulgar অনল?'

অনল কৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত বলিল, 'vulgar? পাগল নাকি? মেয়েদের monopolyতে হস্তক্ষেপ কর্বার মত শক্তি কই?'

দীপ্তি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'তুমিও ত কিছু কম যাও না দেখছি।'

অনল কাঁধ দুইটা নাড়িয়া বলিল, 'I can't help it, your company makes me vulgar.'

দীপ্তি বলিল, 'তবুও ত সঙ্গ নিতে ছাড় না দেখি।'

অনিল বলিল, 'প্রয়োজন বোধ কর্লেও কার্যক্ষেত্রে পেরে উঠি না তোমাদের আগ্রহের আতিশয্যে।'

কথাবার্ত্তার গতি ক্রমশঃই পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে দেখিয়া বেলা বলিল, 'যাগগে ওসব কথা, তুই থাম দীপ্তি; থাম না অনল।'

অনল বলিল, 'আমিত কিছু বলিনি, আমায় বলাচ্ছে।'

দীপ্তি বেলার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল, 'তুমি তাহলে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই মেয়েদের সঙ্গে মেশ তাই না অনল?'

অনল কি যেন একটা চিন্তা করিয়া লইয়া বলিল, 'নিঃসন্দেহে।'

দীপ্তি বলিল, 'অতবেশী অহংকার ভাল নয় অনল!'

অনল ভাল মানুষের মত মুখ করিয়া বলিল, 'অহংকার কোথায় দেখলে? বরং আমিত সবসময়ই বলি 'আমার মাথা নত করে দাওহে তোমার চরণ ধূলার পরে, সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।' তাহার কথার ধরণে সকলেই হাসিয়া উঠিল।

দীপ্তি বলিল, 'তোমার প্রার্থনা ভগবান পূর্ণ কর্বেন।'

অনল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পাশ্চাত্যের অনুকরণে শরীরের উপরিভাগটুকু কিঞ্চিৎ সম্মুখে বাঁকাইয়া দিয়া বলিল, 'ধন্যবাদ, আমি এবার যেতে পারি কি?'

দীপ্তি বলিল, 'এখন তামাসা কর্ছ, কিন্তু একদিন আসবে যখন মেয়েদের কাছে তোমায় হাত পেতে দাঁড়াতে হবে।'

অনল বলিল, 'কি চাইতে হবে সেটাও বলে দাও।'

দীপ্তি বলিল, 'সেটা সেদিন নিজেই বুঝতে পার্বে।'

অনল ওষ্ঠ বিকৃত করিয়া বলিল, 'চাইবার মত কিছু আছে বলে ত মনে হয় না।'

তীব্রকণ্ঠে দীপ্তি বলিল, 'কিছুই নেই?'

অনল বার কতক মাথা নাড়িয়া বলিল, 'কিছু না—কিছু না—Women have nothing of their own excepting some curves and crevices of their bodies.'

এতবড় কঠিন এবং মর্মান্তিক অশ্লীল কথা অতি আধুনিক দীপ্তিও বোধ করি অসংকোচে কাহাকেও কখন বলিতে শোনে নাই। মুহূর্তের জন্য

সকলকে স্তম্ভিত থাকিতে দেখিয়া অনল বলিল, 'আচ্ছা—আজ চলি।' বলিয়া ধীরপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। শুধু সকলের অলক্ষ্যে শিখা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে অনলের পানে চাহিয়া রহিল। কিন্তু অনল বা অন্যান্য মেয়েরা কেহই তাহা জানিতে পারিল না।

মানুষ সর্বাপেক্ষা ভুল করে তখনই, যখন সে কাহারও কথাবার্তা বা আচার-ব্যবহার দেখিয়া সেই মানুষটির সম্বন্ধে একটা সুনিশ্চিত ধারণা করিয়া লয়। একজন বুদ্ধিমান মানুষ যে আপনার ইচ্ছামত একদল স্বল্পবুদ্ধি মানুষকে অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য যথেচ্ছভাবে পরিচালিত করিতে পারে, এই কথাটাই সাধারণ মানুষ বুঝিতে পারে না। কারণ বুদ্ধি বস্তুটিই সংসারে একমাত্র বস্তু যাহা সংসারে কোন মানুষই স্বীকার করে না যে, কাহারও অপেক্ষা তাহার কম আছে। ফলে অনলের সম্বন্ধে তাহার সহপাঠীরা সকলেই ভাবিত যে অনলকে তাহারা নির্ভুলভাবে বুঝিতে পারিয়াছে। অনলের কাছে নানা বয়সের নানা মেয়ের ছবি দেখিয়া অথবা নানা ছাঁদের পত্র দেখিয়া সকলেই তাহার সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হইয়াছিল। এবং স্বাভাবিক দুর্বলতা বশতঃ স্থায়ীভাবে অনলের সঙ্গলাভ করিবার উদ্দেশ্যে নানাভাবে তাহার মনস্তুটির আয়োজন করিত। অনল কোন কথা না বলিয়া, মনে মনে হাসিত। সঙ্গীদের নির্লজ্জ আচরণ অসহ্য বোধ হইলে আমার কাছে আসিয়া সব কথা বলিত। এই কথা কিন্তু তাহার সঙ্গীরা কেহই জানিতে পারে নাই। অনল তাহাদের নিজের খুসীমত যাহা বুঝাইয়াছে, তাহারাও তাহা অনলের অকপট স্বীকৃতি বলিয়া গ্রহণ করিয়া মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিয়া দেখে নাই যে একজন মানুষ সংসারে ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তির মানুষের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়াও অহর্নিশি নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে। তাই অনলের সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা করিয়াছে ভাবিয়া সাধারণ মানুষ যতবেশী নিশ্চিন্ত হইত, ততবেশীই

তাহারা অনলের প্রতি অবিচার করিত। অবশ্য ইহার জন্য দোষ অনলের যত বেশী, সাধারণ মানুষের তত বেশী নহে।

আমি মাঝে মাঝে অনলকে প্রশ্ন করিতাম, 'আচ্ছা অনল, এমনি করে মানুষের কাছে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে তোর লাভ কী?'

প্রত্যুত্তরে অনল বলিত, 'এছাড়া উপায় কি? তুই কি ভাবিস একপাল ছাগলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি সব কথা বলব?'

মানুষের প্রতি তাহার গভীর অবজ্ঞা আমায় সত্যিই ক্ষুব্ধ করিত। ক্ষুন্নকণ্ঠে বলিতাম, 'মানুষকে তুই যেন গ্রাহ্য করিস না, কি পুরুষ কি মেয়ে সবই যেন তোর তাচ্ছিল্যের সামগ্রী। তুই কি ভাবিস্ বল ত?'

অনল হাসিয়া বলিত, 'ভাবব আবার কি?'

প্রশ্ন করিতাম, 'তুই মানুষকে এত ছোট ভাবিস্ কেন বলত?'

বিস্মিত হইয়া অনল বলিত, 'ছোটকে ছোট ভাবব তাতে আর অন্যায় কি আছে?'

প্রথম প্রথম অনলের কথাগুলিকে অতিশয়োক্তি বলিয়াই মনে হইয়াছিল আমার। কিন্তু সময়ে সময়ে আমারও মনে হইত নিশ্চয়ই অনল এমন কিছু দেখিয়াছে, যাহা না হইলে সে এমন কথা বলিতে পারিত না। বিশেষতঃ যখন নানা বয়সের ছেলেদের অনলকে ঘিরিয়া অকারণে উচ্চহাস্য করিতে দেখিতাম, অথবা অশ্লীল আলোচনা করিতে শুনিতাম, তখন স্বতঃই মনে হইত, অনল ঠিকই বলিয়াছে।

অনলকে আমি ভালবাসিয়াছিলাম, তাই অনলের অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি অসঙ্কোচে ক্ষমা করিয়া লইয়া তাহাকে আপন করিয়া লইতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু যাহারা অনুক্ষণ অনলের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহাদের আচার ব্যবহার যে অনলকে প্রতিমুহূর্ত্তে তাহাদের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দিয়াছে, একথা তাহারা ভাবিতেও পারে নাই। বিশেষতঃ তাহাদের সহিত আলাপ আলোচনার সময়ে অনল অপূর্ব

নিপুণতার সহিত একরাশ অপ্রয়োজনীয় মিথ্যা কথা বলিয়া যাইত। এবং সে নিজে সেই দুর্ভেদ্য মিথ্যার যবনিকার অন্তরালে সর্বদাই আত্মগোপন করিয়া থাকিত। তাহার সঙ্গীরা জানিত অনল লম্পট, অনল কামুক, অনল মদ্যপ। কিন্তু এই সমস্ত কথা যে সম্পূর্ণ সত্য নয়; অনলের যে আরও একটা পরিচয় আছে তাহা নিশ্চিত ভাবে না জানিলেও কেমন করিয়া জানিনা মনে হইয়াছিল ইহা তাহার একটা ছদ্মবেশ মাত্র। কিন্তু সেই কথা আমি কাহাকেও বলিতে পারি নাই। অনলের নিষেধ ছিল বলিয়া নহে। বলি নাই তাহার কারণ, জানিতাম অনলের সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে কেহই আমায় বিশ্বাস করিবে না; উপরন্তু হাসিয়া উড়াইয়া দিবে অথবা আমাকে পাগল সাব্যস্ত করিবে। তাই নিতান্ত বুদ্ধিমানের মতই চুপ করিয়া থাকিতাম। শুধু যখন চুপ করিয়া থাকিতে অসহ্য বোধ হইত তখন কলীধনের সহিত আলোচনা করিতাম।

এই আরেকটি মানুষ যে অতি সহজেই অনলের স্বরূপটি চিনিয়া লইয়াছিল; এবং মুহূর্ত্তের পরিচয়ে তাহাকে ভালবাসিয়াছিল। আমার এবং কালীধনের মধ্যে পার্থক্য ছিল এই যে, আমি অনলকে অসঙ্কোচে ভালবাসিয়াছিলাম, তাহার সম্বন্ধে কোনকিছু না ভাবিয়াই তাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম। অনলের ত্রুটিবিচ্যুতি আমাকে পীড়া দিত, ক্ষুন্ন করিত; ব্যথিত হইয়া ভাবিতাম, এমন সুন্দর মানুষটি কেন এমন করে—। কিন্তু কালীধন অনলকে বিচার করিয়া গ্রহণ করিয়াছিল—অনলের প্রতিটি কথাবার্তা আচার ব্যবহার মনোবিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া তবে সে তাহাকে গ্রহণ করিত। তাই অনলের সম্বন্ধে তাহার বিশেষ দুর্বলতা ছিল না।

একদিন আমি এবং কালীধন কলেজের গেটের কাছে দাঁড়াইয়া আছি এমন সময়ে অনল আসিয়া উপস্থিত হইল।

বলিলাম, 'কিরে, এমন হন্তদন্ত হয়ে কোথা থেকে আসছিস ? আবার নূতন কিছু করে এলি নাকি ?'

অনল বলিল, 'দূর! বলিয়া কালীধনকে বলিল, আচ্ছা বড়দা আমায় একটা কথার মানে বুঝিয়ে দিতে পার ?'

কালীধন হাসিয়া বলিল, 'তোমার কথার মানে ? সেত বিশেষ সহজ বস্তু বলে মনে হয় না।'

অনল বলিল, 'ঠিক তাই। আমি জানতে চাই ভালবাসা কি ? মানুষের জীবনে ভালবাসা সত্যিই সম্ভব কিনা ?'

আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে অনলের মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। কালীধনও যথেষ্ট বিস্মিত হইয়া বলিল, 'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন অনল ?'

অনল বলিল, 'প্রয়োজন আছে। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি। তুমি যা বলবে আমি তার প্রতিবাদ করার চেষ্টা কর্ব, এবং যা বলবে তা নিরপেক্ষভাবে বলবে। কারণ এই জন্যই অরুণকে জিজ্ঞাসা না করে তোমায় জিজ্ঞাসা কর্ছি। অরুণটা আস্ত idiot. আমার সম্বন্ধে ওর দৌর্বল্য আছে মেয়েদের মত। Because he loves me too much.'

কথাটা শুনিয়া কালীধন এবং আমি উভয়েই হাসিয়া ফেলিলাম।

কালীধন বলিল, 'বুঝলাম। তুমি কি বলতে চাও তাই আগে বল।'

অনল কিছুমাত্র ইতঃস্তত না করিয়া বলিল, 'আমি বলি ভালবাসা বলতে কোন কিছু নেই। ভালবাসা মানে স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে ভালবাসার কথাই বলছি। যা দিয়ে এত কাব্য সাহিত্য রচিত হচ্ছে। এত মানুষ বুক চাপড়াচ্ছে আর চোখের জল ফেলছে, সে সবই বাজে।'

কালীধন তর্জ্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে চশমাটা ঠিক করিয়া লইয়া বলিল, 'তোমাকেই আমি প্রশ্ন কর্ছি—এই যে বল্লে কিছুই নেই, অথচ তাই নিয়ে এত কাব্য সাহিত্য রচিত হচ্ছে বা এত মানুষ চোখের

জল ফেলছে, এর মধ্যে যদি সত্যিই কিছু না থাকে, তাহলে এগুলি সম্ভব হয় কি করে?'

অনল বলিল, 'আছে। একটি মাত্র জিনিষ, তা হল Sex.'

কালীধন বলিল, 'ঠিক। Sexটাই যে সব নয় একথা কি তুমি স্বীকার কর?'

অনল দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, 'না করি না। আমি বলি মানুষ দেহ ছাড়া অন্য কোন বিষয় নিয়েই চিন্তা করে না। তারা—'

বাধা দিয়া কালীধন বলিল, 'তাহলে কাব্য সাহিত্য—এসবগুলো?'

অনল বলিল, 'ওগুলো একটা মিথ্যার আবরণ। মানুষ বোঝে যে সব কথা সোজাসুজি বলা চলে না। যেমন ধর, কোন মেয়েকে যদি আমি সোজা গিয়ে বলি—'

কালীধন বলিল, 'থাক্ থাক্ আর অশ্লীলতা কর না। বরং যা বলছ তাই বল।'

অনল যে কি বলিতে যাইতেছিল তাহা বুঝিতে পারিয়া আমিও হাসিয়া ফেলিলাম। অনলের মুখে কোন অশ্লীল কথাই বাধে না।

অনল বলিল, 'তাই বলছি যে কতকগুলো বাজে কথা দিয়ে নিতান্ত নোংরা জিনিষগুলোকে সামনে তুলে ধরে বাহবা নেবার চেষ্টা করাই মানুষের স্বভাব। কিন্তু তাতে লাভ কী? যা চাইব তা যদি সোজাসুজি চাইতে না পারি ভালই, না হলে তা নিয়ে কাব্য করা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়।'

কলীধন বলিল, 'কাপড় জামার নীচে সব মানুষই উলঙ্গ, কিন্তু তাই বলে কি কাপড় জামা ছেড়ে উলঙ্গ হয়ে থাকতে হবে?'

অনল বিনা দ্বিধায় বলিল, 'পারলে ভাল হত। পৃথিবীটা অনেক নোংরামির হাত থেকে বাঁচত।'

কালীধন অনলের কথার ভঙ্গীতে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, 'এটা

তুমি জোর করে বলছ অনল? না হলে তুমি ত জান যে কুৎসিতকে সুন্দর আবরণ দিয়ে প্রকাশ করার মধ্যেই মানুষের শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।'

অনল বলিল, 'স্বীকার করি। কিন্তু তা দিয়ে কুৎসিতকে সুন্দর করে তোলা যায় না। সে প্রচেষ্টাও শোভন নয়।'

কালীধন বলিল, 'তুমি যা বল্লে সে যদি সত্য বলে মেনে নিতে হয় তাহলে বলতে হয় যে আদিম যুগে মানুষ শান্তিতে ছিল।'

অনল বলিল, 'শান্তি বলতে তুমি কি বলছ জানি না—কিন্তু আদিম যুগের মানুষেরা যে অবস্থায় বেঁচে ছিল আজকের দিনে মানুষ তার চেয়ে কিছুমাত্র বেশী উন্নত হয়নি।'

বিস্মিত হইয়া কালীধন বলিল, 'এ তুমি কি বলছ অনল?'

অনল দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, 'ঠিকই বলছি। তখনকার দিনে মানুষের পরণে কাপড় ছিল না; প্রবৃত্তি ছিল পশুর মত, সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকতে হত; সাবধানে চলাফেরা করত আচার-ব্যবহারও ছিল পশুর মত—প্রবৃত্তির তাড়নায় উন্মত্তের মত ভোগ্য বস্তুকে ছিনিয়ে নিত অপরের হাত থেকে। আর আজকের দিনে ত মানুষ সভ্য হয়েছে, বৈজ্ঞানিক সভ্যতার দৌলতে মানুষ কত উন্নত হয়েছে; পোষাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আচার ব্যবহার শান্ত সংযত হয়েছে। কথায়-বার্তায় মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, মানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে সমাজ, সভ্যতা আরও কত কি! কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে আদিম যুগের সেই হিংস্র মনোবৃত্তি, সেই পাশবিক কামোন্মত্ততা কিছুমাত্র সংযত হয়নি। দেখ ত ধর্মের নামে, জাতির নামে, বড় বড় যুদ্ধ হচ্ছে—যে নির্বোধের দল মরছে তারা সকলেই শহীদ, সকলেই দেশভক্ত বীর। দেখবে মানুষের কুটিল কটাক্ষপাত গোপনে গোপনে অপরিচিতা নারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তন্ন তন্ন করে খুঁজে মরছে সামান্য

নোংরামির আশায়—দেখবে শহরের অখ্যাত পল্লীতে একদল মানুষের ভিড়, খ্যাতনামা সভ্য ব্যক্তিদের সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে, ঘরের মেয়েদের পেশাদারী চালচলনে, কথাবার্তায় অপরিচিত পুরুষকে প্রলুব্ধ করার হীন প্রচেষ্টা—দেখেছ এসব? এর মধ্যে কি সৌন্দর্য দেখেছ তুমি শুনি?' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া অনল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কালীধনের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া যেন আগুন ঝরিতে লাগিল।

কালীধন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তাই যদি হয়, তাহলে তোমার প্রশ্নের উত্তর তুমি নিজেই পেয়েছ। ভালবাসা বলতে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই।'

অনল যেন জ্বলিয়া উঠিল, বলিল 'নেই-ই-ত।'

কালীধন বলিল, 'তবে এ প্রশ্ন আমায় করলে কেন?'

অনল বলিল, 'ভেবেছিলাম তুমি নূতন কিছু বলতে পারবে। কিন্তু দেখছি, তুমি আমারই মত বাজে মার্কা—'বলিয়া বিস্মিত স্তম্ভিত কালীধনকে কোন কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া ত্রস্তপদে কলেজের ভিতর ঢুকিয়া গেল। তাহার গতিশীল দেহটার পানে এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া সদীর্ঘশ্বাস কালীধন বলিল, 'অদ্ভুত ছেলে!'

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় আবার অনল আসিয়া হাজির। আগেই বলিয়াছি আমাদের বাড়ীতে তাহার অবাধ গতিবিধি ছিল। সোজা আমার পড়ার ঘরে আসিয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিতে বসিতে বলিল, 'কি good boy, কি খবর?'

লক্ষ্য করিলাম তাহার মুখে-চোখে আনন্দের অস্পষ্ট আভাস; কথাবার্তায় কিছুটা সহজ সুর।

বলিলাম, 'আমার আর নতুন খবর কি থাকবে! তোর খবর কি তাই বল? সকালে অমন উদ্ভট প্রশ্ন করে পালিয়ে এলি কেন বল ত?'

কথাগুলি বিশেষ কোন উদ্দেশ্য লইয়া বলি নাই। কিন্তু সে শেষ কথাগুলি শুনিয়া একটু চঞ্চল হইয়া পড়িল। মানুষের খুঁটিনাটি চালচলন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিবার মত শক্তি আমার কোনদিনই ছিল না। কিন্তু তাহার চাঞ্চল্যটুকু এত বেশী প্রকট হইয়া পড়িল যে তাহা আমার মত অনভিজ্ঞেরও দৃষ্টি এড়াইল না।

অনল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'পালিয়ে এলাম ?'

রহস্য করিয়া বলিলাম, 'পালালি না-ত কি ?'

সে তেমনি করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'খুব যে ওস্তাদি মার্ছিস্। বড়দার কাছে শিখেছিস্ বুঝি।'

বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হইয়া বলিল, 'আচ্ছা অরুণ, তুই সত্যি বিশ্বাস করিস যে একটা পুরুষ এবং একটা মেয়ের মধ্যে ভালবাসার সৃষ্টি হতে পারে দৈহিক সম্ভোগের প্রয়োজন সম্পূর্ণ অস্বীকার করে? এমন ভালবাসার অস্তিত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিস তুই ?'

বলিলাম, 'তর্ক যদি না করিস ত বলি।'

বলিল, 'বল।'

উত্তর দিলাম, 'বিশ্বাস করি।'

অনল বলিল, 'কেন বিশ্বাস করিস ? কোন প্রমাণ পেয়েছিস ?'

বিপন্ন হইয়া বলিলাম, 'ঐ তোর দোষ। তুই বড় কথা বাড়াস।'

বাস্তবিক আমার পক্ষে অন্য কিছু বলা সম্ভব ছিল না। কারণ অনলের প্রশ্ন আমার কাছে নূতন নহে। নিজেকেও নিজে ঐ একই প্রশ্ন করিয়াছি। দেহাতীত বলিয়া কোন কিছু আছে কিনা, অথবা থাকিলেও তাহার মূল্য বা মর্যাদা কতখানি হওয়া উচিত; এই সমস্ত কথা কখনও চিন্তা করিয়া দেখি নাই। শুধু নিজের অজ্ঞাতসারেই একটা কথা মনের মধ্যে স্থায়ীভাবে আশ্রয় লাভ

করিয়াছিল, সে কথাটা হইতেছে যে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে দৈহিক কামনার সহিত সকল সম্পর্কশূন্য সহজ সম্বন্ধ সম্ভব। কিন্তু কি করিয়া সম্ভব অথবা সেই সম্বন্ধে কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিংবা চাক্ষুষ পরিচয় আছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তর যে কোনদিন কাহাকেও দিতে হইবে তাহা ভাবি নাই। অনল প্রশ্ন করিবার বহুদিন আগে তাহাকেও আমার বিশ্বাসের কথা কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার অবিশ্বাসী অন্তর তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেই সে সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা কোনদিন করি নাই। তাই আজ সহসা অনলের প্রশ্নে অতর্কিতে আন্তরিক সত্য কথাটি বলিয়া ফেলিয়াই বুঝিলাম নিতান্ত ভুল করিয়াছি। কারণ প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক মতবাদের সমর্থক অনলের কাছে দেহাতীত ভালবাসার কথা মূল্যহীন উক্তিমাত্র তাহা বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হইল না। আমার নিজের কথার স্বপক্ষে আমার নিজেরই যে কোন যুক্তি নাই তাহা নিজেও জানিতাম। তাই আমার কথা শুনিয়া অনল শতসহস্র প্রশ্ন এবং প্রতিবাদ করিবে ইহাই ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অনল সে সবের ধার দিয়াও গেল না। বরং তাহাকে যখন বলিলাম 'তুই বড় কথা বাড়াস', তখন অনল যেন, তাড়াতাড়ি আমার কথাগুলি সমর্থন করিবার জন্য বলিয়া উঠিল, 'না-না কথা বাড়াচ্ছি না। শুধু জিজ্ঞাসা কর্ছি, তুই কি এমন অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল যার জোরে এতবড় কথাটা বল্লি। অথবা এ শুধু নিছক কথার কথা!'

বলিলাম, 'অভিজ্ঞতা আমার কোনদিন নেই; হবে বলে ভরসাও হয় না।'

অনল বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলিল, 'ওঃ, এটা তাহলে তোর সুচিন্তিত বাণী। কিন্তু আমার মনে হয় ভালবাসার মধ্যে দেহের ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই নেই। শুধু ভালবাসাই বা বলি কেন—Life is nothing without sex.'

তাহার কথায় আঘাত পাইয়া বলিলাম, 'তুই যা খুশী বলতে পারিস। তবে কথাটা সত্য বলে নিজে বিশ্বাস করি ; মনে হয় দেহের প্রয়োজন বাদ দিয়েও ভালবাসা সম্ভব। অর্থাৎ এমনও হয় যে কোন একজনকে অসঙ্কোচে ভালবাসি ; তার দৈহিক সৌন্দর্য্যের চুলচেরা বিচার না করেই অথবা সে সৌন্দর্য উপভোগ করার সামান্যতম আশা না রেখেই।'

অনল আমার কথা শুনিতে শুনিতে বোধকরি অন্যমনস্ক হইয়া গেল। কথা শেষ করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলাম, 'কিন্তু একথা হঠাৎ জিজ্ঞাসা কর্ছিস কেন বল্‌ত?'

অনল যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল, 'না, এমনি। এই কথাটা নিয়েই একজনের সঙ্গে তর্ক হয়েছিল—'

কথাগুলি বলিবার নিপুণভঙ্গী সত্বেও বুঝিলাম, সে মিথ্যা কথা বলিতেছে এবং কি একটা কথা যেন অতি যত্নের সহিত গোপন করিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহা লইয়া আর কোন প্রশ্ন করিলাম না। কারণ জানি প্রশ্ন করিয়া লাভ নাই। কোন কথা সে ইচ্ছা করিয়া না বলিলে কাহারও সাধ্য নাই তাহার নিকট হইতে তাহা বাহির করিয়া লয়। দুইজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসিয়া রহিলাম। দুইজনেই নীরব।

হঠাৎ অনল বলিল, 'আজ চলি।'

বলিলাম, 'আচ্ছা'। বলিয়া তাহার সহিত ঘরের দরজা পর্যন্ত আসিলাম। চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইয়া সে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আমার কাঁধে একটা হাত রাখিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, 'অরুণ, I sincerely believe what you have said, really there is something above sex.'—বলিয়া ত্বরিতপদে বাহির হইয়া গেল। বিস্মিত হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম।

তাহার অতলস্পর্শী মনের মধ্যে যে প্রশ্ন জাগিয়াছে তাহার সন্ধান করিবার মত বুদ্ধি বা শক্তি আমার ছিল না। সকালে কলেজের গেটের

সম্মুখে দাঁড়াইয়া কালীধনকে ঐ একই প্রশ্ন করিয়া সে হঠাৎ চলিয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যাবেলায় আবার আমার কাছে ঐ একই প্রশ্ন করিয়া তাহার স্বভাব সুলভ বিদ্রূপের দ্বারা আমায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া আমার কথা-গুলি অবিশ্বাস করিবার ভাণ করিয়াছিল, এবং বিদায় গ্রহণের পূর্বমুহূর্তে সহসা নিজমুখে স্বীকার করিয়া গেল যে দেহাতীত কোন কিছুর অস্তিত্বে সে বিশ্বাস করে। তাহার এই পরস্পরবিরোধী সামঞ্জস্যহীন উক্তি-গুলির কোন্‌টা সত্য তাহা তাহার সহিত স্বল্প-পরিচিতদের পক্ষে বুঝিতে পারা সহজ নহে। সংসারের চিরাচরিত পথ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পথে যে মানুষটি পা বাড়াইয়াছে তাহার পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া সেই মানুষটির গতিভঙ্গী নিরূপণ করিবার মত ধৃষ্টতা আর যাহারই থাক্ আমার নাই। যাহাদের মধ্যে সে অষ্টপ্রহর ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের কাছে সে হাল্কা স্বভাবের মানুষ বলিয়া খ্যাত। কিন্তু তাহার মনের মধ্যে যে অনির্বাণ বেদনার বিক্ষুব্ধ বহ্নিশিখা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত ছিল তাহার সন্ধান সংসারে খুব কম মানুষই জানিত। এবং সেই বহ্নিশিখার উত্তাপ হইতে সাধারণ মানুষকে অক্ষত দেহে বাঁচাইবার দুরূহ প্রচেষ্টায় সে তিলে তিলে আত্মদান করিয়া গেল। প্রতি পদে পদে মানুষ তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে; তবু তাহার মুখের স্বাভাবিক হাসিটুকু ম্লান হইতে দেখি নাই; কোনদিন তাহাকে অভিযোগ করিতে শুনি নাই। প্রথমে আমিও বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু অসতর্ক মুহূর্তে তাহার দু'একটা কথা হইতে এইটুকু শুধু বুঝিয়াছিলাম যে নিরবিচ্ছিন্ন ভোগলালসার জীবন-যাপন করিয়াও সে মুহূর্তের জন্য শান্তি পায় নাই; অপর্যাপ্ত আনন্দের আয়োজনের মধ্যেও তাহার মন কখনও তৃপ্তি পায় নাই।

মাঝে মাঝে সে গুণগুণ করিত, 'মরুভূমিতে করেছি আনাগোনা। তৃষিত হিয়া চেয়েছে যাহা নহে তা হীরা সোনা। পর্ণপুটে একটু শুধু জল। উৎসতটে খেজুর মূলে ক্ষণিক ছায়াতল।' এই সামান্য কথা

কয়টির মধ্য দিয়া সে অকপটে আপনার অন্তরের স্বীকৃতি ঘোষণা করিয়া গিয়াছে। সংসারের মরুভূমিতে অক্লান্ত পদচারণা করিয়া, উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে জীবন-যাপন করিয়াও সে শান্তি পায় নাই। তাহার তৃষ্ণার্ত্ত অন্তরের বিরুদ্ধ হাহাকার সংসারের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যর্থ প্রতিধ্বনি তুলিয়া ফিরিয়াছে, কাহারও সাড়া পায় নাই। তাহার প্রার্থিত জীবন, তাহার বাঞ্ছিত মানুষটিকে সে পায় নাই। জীবনের খরতপ্ত ঊষর মরুপথে তাহার সমান্ত বিশ্রামলোভী তৃষ্ণার্ত্ত অন্তরের আকুল আবেদন সংসারে কাহারও কাণে পৌছায় নাই। জীবনের মধ্যদিনে যখন প্রখর সূর্য্যালোক তাহার অন্তরের সমস্ত মাধুর্য নিঃশেষে শুষিয়া লইয়াছে তখন তাহার রিক্ত অন্তরের ব্যাকুল ক্রন্দন মানুষ শুনিতে পায় নাই। মানুষের দ্বারে দ্বারে অযাচিতের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষ পর্যন্ত একদিন সুদূর প্রবাসে অখ্যাত অজ্ঞাত অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করিয়া লইল। তবুও মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলে নাই। যখন প্রশ্ন করিয়াছি, 'এমন আত্মগোপন করে থেকে তোর লাভ কী?' সহজ মানুষের মত বাঁচতে চাসনে তুই?'—তখন প্রত্যুত্তরে হাসিয়া বলিয়াছে, 'বাঁচতে দিচ্ছে কই? এখানে সহজ হয়ে বাঁচা মানে চোখ-কান বন্ধ করে নোংরামি করা।' প্রশ্ন করতাম, 'তার মানে?' জবাব দিত, 'গতানুগতিকতার ধারা বহন করে, পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করে লেখাপড়া শেষ করে একটি বিবাহ করা—একটি চাকরীতে ঢোকা। তারপর স্বল্পাহারী কর্মক্লান্তদেহে স্ত্রীর সঙ্গে নৈশ অভিযান—তারপরেই সন্তানের পিতা—' কথাগুলি বলিবার সময় তাহার কণ্ঠস্বরে ফুটিয়া উঠিত তীব্র বিদ্রূপের আভাস। বলিতাম, 'তাহলে কি করতে চাস জীবনে?' পরম অবজ্ঞাভরে জবাব দিত, 'কিছু না—কিছু না—তবে যাই করি না কেন, ওভাবে বাঁচব না।' বলিতাম 'কিভাবে বাঁচবি শুনি?' বলিত, 'সেটা আমারও জানা নেই। তবে এইটুকু জানি—' বলিয়াই অসমাপ্ত কথার মধ্যপথে থামিয়া যাইত।

বলিতাম, 'থামলি কেন বল?' মাথা নাড়িয়া বলিত, 'না, সেটা নিজের চোখেই দেখতে পাবি।'—ইহাই তাহার স্বরূপ। তাহার কথা বলিতে গেলে অনেক যুক্তি-তর্কের অবতারণা হইবে, অনেকে অনেক কথা বলিবে। অনেককে বলিতে শুনিয়াছি, 'ছেলেটা worthless.' কথাটা শুনিবামাত্র মনের মধ্যে একটা সুতীব্র ব্যথা অনুভব করিয়াছি। প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াই সহসা নীরব হইয়া গিয়াছি। কারণ জানি অনলকে ভালবাসিয়াছিলাম বলিয়াই তাহার মূল্য আমার কাছে অসীম বলিয়া মনে হইত। তাহার কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার আমার ভাল লাগিয়াছে। প্রচলিত জীবনের পথ হইতে স্বেচ্ছায় তাহাকে পথভ্রষ্ট হইতে দেখিয়া মনে মনে গভীর বেদনা বোধ করিয়াছি। কিন্তু তাহার আচার-ব্যবহারের স্বপক্ষে সমর্থনযোগ্য যুক্তি খুঁজিয়া পাই নাই। সুতরাং তাহাকে লইয়া আমার তর্ক করা সাজে না। কারণ তাহার বিপক্ষে যাহারা বলিবে তাহাদের সঙ্গত যুক্তি আছে, কিন্তু আমার কিছুই নাই। অতএব চুপ করিয়া থাকা ছাড়া উপায় ছিল না।

একদিনের কথা মনে পড়ে। অনলের অনুপস্থিতিতে অধৈর্য হইয়া আমি আর কালীধন কলেজের নিকটবর্তী পরিচিত চায়ের দোকানে গিয়া ঢুকিতেই দেখি একটা টেবিলের চতুষ্পার্শে আমাদেরই কলেজের কয়েকটি ছাত্র তুমুল তর্ক জুড়িয়াছে। তর্কের বিষয়বস্তু অনল। ছেলে-গুলি অনলেরই প্রথম সঙ্গীদলের কয়েকজন। একজন বলিল, 'দূর্ দূর্ ওসব চাল। He is nothing but a humbug.'

অপর একজন বলিল, 'আগাগোড়া চাল নাও হতে পারে।'

তাহার কথার মাঝপথেই একজন বলিল, 'এইত সেদিন এক কড়া লাট গাড়ী করে এসে হাজির অনলকে খুঁজতে।

লক্ষ্য করিলাম তাহাদের কাহারও কথায় ভদ্রতার কোন আবরণ নাই।

প্রথম জন বলিয়া উঠিল, 'দেখগে সে হয়ত অনলের মাসতুত কি পিসতুত বোন হবে?'

একজন বলিল, 'বোনকে নিয়ে ঠাট্টা করবে?'

প্রথম বক্তা ঠোঁট উন্টাইয়া বলিল, 'আশ্চর্য কিছু নয়। ওর মত ছেলে সব পারে।'

কথা শুনিয়া কালীধন আমার মুখের পানে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল।

একজন বলিল, 'তুমি কি বলতে চাও বরেন, অনল যে সমস্ত চিঠিপত্র দেখিয়েছে সব বাজে—।'

প্রথম বক্তার নাম বরেন। সে বলিল, 'চিঠি তোমাদেরই দেখিয়েছে। কই আমাদের কাছে ত ঘেষেনি।'

দুই একজন বলিল, 'তা বটে। চালমারা যে ওর স্বভাব তা ওকে দেখলেই বোঝা যায়।'

অন্য কয়েকজন প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, 'তবুও ত ওর সঙ্গে ঘুরতে ছাড়না।'

কয়েকজন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বরেন রাগিয়া বলিল, 'আমায় কখনও ওর সঙ্গে ঘুরতে দেখেছ—**never**—'

প্রতিবাদকল্পে একজন বলিল, 'তুমি ঘুরবে কি? ও তোমায় পাত্তাই দেবে না?'

বরেন বলিল, 'যা যা জানা আছে'। ওর কিছু জানতে বাকী নেই। ও বলত ওর বাপ প্রফেসর।

দুই একজন বলিল, 'নয় নাকি?'

প্রত্যুত্তরে একটা অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করিয়া বরেন বলিল, 'সব জানিস তোরা। ওর বাবা ডায়মণ্ডহারবারের একটা স্কুলের হেডপণ্ডিত।'—বলিয়া নিজের মনেই বলিল, 'প্রফেসার? প্রফেসার হওয়া চারটিখানা কথা কি না?'

উপস্থিত ছেলেগুলা নির্বাক হইয়া গেল। এত বড় মিথ্যা পরিচয় দিয়া একটা মানুষ অসঙ্কোচে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে তাহা বোধহয় তাহাদের জানা ছিল না।

একজন বলিল, 'আসুক শালা এবার।'

অপর একজন সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বরেনকে বলিল, 'তুই জানলি কি করে?'

বরেন নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিল, 'আমার এক বন্ধুর সঙ্গে অনলের খুব ভাব—তার কাছ থেকে ওর সব history শুনছিলাম।'

এতবড় প্রমাণের পর আর কথা চলে না। সকলেই চুপ করিয়া গেল। শুধু আগাগোড়া সব শুনিয়া আমি আর কালীধন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। টেবিলের উপর গরম চা জুড়াইয়া জল হইয়া গেল।

পরদিন অনলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বরেনকে চিনিস?'

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'বরেন? কোন বরেন বলত?'

বলিলাম, 'তা জানি না। আমাদের কলেজেই পড়ে—মোটামত চোখে চশমা—ফর্সা রঙ'—কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করিয়া বলিল, '3rd yearএর বরেন। হ্যাঁ হ্যাঁ চিনি। কেন বলত?'

আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলিতেই অনল উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'তাই বলেছে নাকি? শালা আচ্ছা খচ্চর ত?'

বলিলাম, 'ও ওসব কথা জানল কি করে?'

হাসিতে হাসিতে বলিল, 'আমিই বলেছি।'

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'ওসব বল্লি কেন?'

উত্তর দিল, 'একদিন কলেজ ষ্ট্রীট দিয়ে মালতী সেনকে নিয়ে আসছি, মালতীকে মনে আছে, সেই যে বেলাদের বাড়ীতে আমার কাণ ধরেছিল?'

ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিলাম, 'মনে আছে।'

অনল বলিল, 'মালতীকে নিয়ে আসছি, হঠাৎ বরেনের সঙ্গে দেখা।

তখনও ওকে ভাল করে চিনি না। নামও জানি না। হঠাৎ 'কি ব্রাদার কি খবর' বলে কাঁধে একটা চড় দিয়ে দাঁড়াল। অবাক হয়ে বললাম, 'আপনাকে ত চিনলাম না।' আমার কাঁধটা নেড়ে দিয়ে বল্লে, 'পেঁয়াজী করছ কেন বাবা?' বল্লাম, 'ভদ্রভাবে কথা বলুন, সঙ্গে মেয়েছেলে রয়েছে।' অবাক হওয়ার ভাণ করে বল্লে, 'ওঃ I am sorry.' ব্যাটা জানে যে মেয়েছেলে রয়েছে। ইচ্ছাটা এই যে আমি ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই—আমার কি ইয়েটা কেঁদেছে, বলিয়া অনল একটা অশ্লীল গাল দিল। বল্লাম, 'আচ্ছা পরে দেখা হবে।' বলে চলে এলাম। তার পরদিন কলেজে আমায় ধরেছে। বলে, 'সঙ্গে ওটি কে বাবা? বল্লাম, 'যেই হোক্ না, আপনার সে খবরে দরকার কি?' বল্ল, 'না দরকার আর কি? দরকার বিশেষ নয়, তবে আমরা যদি একটু প্রসাদ পাই ত'—বলে একটা বিশ্রী ভঙ্গী করল। কি বলব অরুণ, রাগও হল, হাসিও পেল। মারলাম গুল—বল্লাম ও আমার আত্মীয়া, এসেছে ডায়মণ্ডহারবার থেকে—সেখানে আমার বাবা ইস্কুলে পণ্ডিতি করেন—ইত্যাদি।'

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'ওসব কথা বলার কি দরকার ছিল?'

অনল বলিল, 'শালার ছেলে শালা, ছাড়তে চায় না যে আমাকে। ঘায়ের উপর মাছির মত লেগে ছিল।'

বলিলাম, 'তারপর?'

বলিল, 'তারপর একদিন কথায় কথায় ইয়ার্কি কর্ত্তে গেছে—বল্লাম আপনার সঙ্গে মেয়েরা মিশবে কেন শুধু শুধু; আপনার আছে কি? যাহা বলা শালা খচে ব্যোম হয়ে কাট মারল।'

হাসিয়া বলিলাম, 'সেখানে আর কেউ ছিল।'

অনল বলিল, 'নারে, ও আমায় আড়ালে নিয়ে গিয়ে জপাত।'

কথাটা শুনিয়া আমিও হাসিয়া ফেলিলাম। সেই সঙ্গে বরেনের

সদম্ভ মিথ্যা কথাগুলো মনে করিয়া রাগও হইল। অথচ কিছুই করিবার নাই।

দেখিতে দেখিতে দুইটা বছর কাটিয়া গেল। পরীক্ষা আসিয়া গেল। মহাউদ্যমে পরীক্ষার পড়া তৈরী করিবার জন্য স্বেচ্ছায় নিজের পড়ার ঘরে নির্বাসন বাছিয়া লইয়াছিলাম। নমিতার স্বামী কিসের একটা ছুটি উপলক্ষ্যে কয়েকদিনের জন্য সপুত্রক কলিকাতায় আসিয়াছে। নমিতা তখন একটি সন্তানের মাতা। একদিন বিকালবেলায় ছেলেটিকে কোলে লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছি পথে অনলের সঙ্গে দেখা। ছেলেটিকে দেখাইয়া বলিল, 'ওটা কে রে?'

বলিলাম, 'ভাগ্নে, নমিতার ছেলে।'

অপূর্ব খুশীতে অনলের চোখমুখ ভরিয়া গেল। বলিল, 'নমিতার ছেলে? কই দেখি দেখি?' বলিয়া অসীম আগ্রহে দুই হাত বাড়াইয়া ছেলেটাকে কোলে লইয়া অসংখ্য চুম্বনে তাহার মুখটা ভরাইয়া দিয়া বলিল, 'সুন্দর দেখতে হয়েছে ত? মুখটা ঠিক মায়ের মত!'

ছেলেটাকে লইয়া অনল যেন অকারণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সাধারণতঃ এত বেশী উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে তাহাকে দেখি নাই। বিশেষতঃ ছোট ছেলে লইয়া আদর করা ত দূরের কথা; কোলে লইতেও তাহার যথেষ্ট আপত্তি ছিল। তাই নমিতার ছেলেটাকে লইয়া আদর করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেও, মুখে কিছু বলিলাম না। মনে হইল যদি অনল স্বপ্নেও জানিতে পারিত যে নমিতা তাহাকে ভালবাসিয়াছিল, বিবাহের পূর্বে সমস্ত সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়া অনলকেই বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল, কিন্তু শুধু আমারই জন্য সে বিবাহ সম্ভব হয় নাই; তাহা হইলে হয়ত এমনি করিয়া নমিতার সন্তানকে সে আদর করিতে পারিত না।

বলিলাম, 'নমিতার সঙ্গে দেখা করবি না?'

সপ্রতিভ কণ্ঠে বলিল, 'হ্যাঁ কর্ব বইকি? কাল আসব অখন।' বলিয়া চলিয়া গেল।

মনে হইল কাল আসিলে অনলকে আগাগোড়া সব কথা খুলিয়া বলিব। কেন যে একথাটা মনে হইল জানি না। কিন্তু কথাটা মনে হইতেই অনুভব করিলাম একটা অপরিচিত হিংস্র আনন্দের আশায় সমস্ত মনটা যেন উন্মত্তের মত নৃত্য করিতে সুরু করিয়াছে। অনল আমার কথা শুনিয়া আঘাত পাইবে জানি এবং তাহাকে আঘাত দিয়া আমার কোন লাভ হইবে না তাহাও আমার অজ্ঞাত ছিল না। তবুও কেমন যেন একটা জেদের বশবর্ত্তী হইয়াই তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক আঘাত করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। কিন্তু পরদিন অনল আসিল না। তাহার পরদিনও নহে। অনলের বাড়ীতে খোঁজ লইয়া জানিলাম অনল কলিকাতার বহিরে চলিয়া গিয়াছে, কি একটা জরুরী প্রয়োজনে। নিতান্ত দুঃখিত হইয়াই বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। নমিতারা চলিয়া যাইবার পরই অনল ফিরিয়া আসিল। এবং নমিতার সহিত দেখা করিতে না পারার জন্য অযাচিত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আমার সংকীর্ণ-চিত্তকে সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিল। কিন্তু কিছু বলিলাম না।

পরীক্ষা শেষ হইলে অনল আসিয়া বলিল, 'চল কিছুদিনের জন্য কলকাতার বাইরে যাই।'

বেড়াইতে যাওয়ার স্বপক্ষে বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু ব্যয় বাহুল্যের কথা স্মরণ করিয়াই যাইতে অস্বীকার করিলাম। অনল একাই চলিয়া গেল। দিন কুড়ি পরে আমার নামে একটা চিঠি আসিয়া হাজির। লিখিয়াছে অনল। চিঠির বিষয়বস্তু হইতেছে অনলের স্বাভাবিক মোহিনীমায়ায় আকৃষ্ট আর একটি নারীর কাহিনী। লিখিয়াছে, 'একটা ঘটনার উল্লেখ কর্ছি, পড়ে চটে যাস না। জেনে রাখ আমি নির্দ্দোষ। এখানে এসেছি দিন কুড়ি হল। দিন পনের আগে

এখানকার বাঙালীদের একটা ক্লাবে স্থানীয় সঙ্গীদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে যোগদান করে গান করেছিলাম। ক্লাব থেকে বেরুবার পথে এক ভদ্রলোক আমায় ধরলেন তার বাসায় যেতে হবে—গান শোনাবার জন্য। ভদ্রলোকের নাম মোহিনী ভট্টাচার্য, সরকারী কেরাণী, শ দু'য়েক টাকা মাইনে পান। ছোট্ট সংসার, স্ত্রী একটি মেয়ে আর একটি ছেলে—এই চারজনকে নিয়েই তার সংসার। তিনি বার বার করে বলাতে গেলাম একদিন তাঁর বাসায়। ভদ্রলোক যত্ন করলেন, এবং ভদ্রলোক যতনা যত্ন করলেন তার দ্বিগুণ যত্ন করলেন তার স্ত্রী; এবং তার চতুর্গুণ যত্ন কর্ল তার মেয়ে; নাম সুনীতি। বয়স বছর ১৮।১৯ হবে। চেহারা? মনে হল জীবনে এই প্রথম উপলব্ধি কর্লাম সৌন্দর্য কি! বাংলার বাইরে বাঙালী একটা দেখবার জিনিষ। সুনীতির সঙ্গে আলাপ হলো প্রায় যাবার সঙ্গে সঙ্গেই। তার আবার গান বাজনা শেখবার সখ আছে (যা সাধারণতঃ অল্পবয়সী মেয়েমাত্রেরই থাকে) এবং পরদিন থেকে সুনীতির পিতামাতার একান্ত অনুরোধে তার গানের অবৈতনিক শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছি। শিক্ষক ছাত্রীর সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে অরুণ। ঠাট্টার ছলে চলে যাবার কথায় একদিন আঁচলে মুখ ঢেকে পালিয়েছিল। পরদিন অনেক কষ্টে তার অভিমান ভাঙ্গিয়েছিলাম।'

চিঠিটা পড়িতে পড়িতে মনে হইল অনলের দীপ্তি আবার এক অসহায় পতঙ্গকে আকর্ষণ করিয়াছে সুনিশ্চিত মৃত্যুর পানে। আগুণের দোষ নাই, তাহার দীপ্তিরও অপরাধ নাই। অপরাধ বিশ্বকর্মার, যিনি এই বস্তুটিকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

চিঠির শেষে লিখিয়াছে, 'এবার এখান থেকে বাস তুলতে হবে—Sincerely I don't like this—এসব সত্যিই আমার ভাল লাগে না। তবুও অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোথা থেকে যে এসে জোটে কে জানে?' অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় সংবাদাদির পর চিঠি শেষ করিয়াছে। চিঠির

কথাগুলি বারবার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইল স্বষ্টিকর্তা কি মারাত্মক পরিহাসই না করিয়াছেন এই মানুষটিকে লইয়া—যে জীবনকে সে সর্বশক্তি দিয়া উপভোগ করিল, সেই জীবনের প্রতি আজ তার কিছুমাত্র মোহ নাই। স্বচ্ছন্দে লিখিয়াছে এই সব সত্যিই তাহার ভাল লাগে না। অনল সংসারে অনেকের কাছে অনেক মিথ্যা বলিয়াছিল, কিন্তু আমার কাছে কখনও মিথ্যা বলে নাই। তাহার বহু প্রমাণও পাইয়াছিলাম। তাই তাহার চিঠির শেষ কথাগুলিকে নিছক মিথ্যা বলিয়া মনে হয় নাই।

পরীক্ষার ফল বাহির হইল। আমার নাম প্রথম কয়েকজনের ভিতরই খুঁজিয়া পাইলাম। অনল তাহার পূর্বসুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তৃতীয় বিভাগে পাশ করিল। দেখা হইলে বলিলাম, 'Result খারাপ হল কেন?'

প্রত্যুত্তরে আমার মাথায় একটা চড় মারিয়া বলিল, 'আমার Result আবার কবে ভাল হতে দেখলি?'

বলিলাম, 'তবু এবার আশা করেছিলাম তোর result ভাল হবে।'

বলিল, 'তাহলে আমার হয়ে তুই পরীক্ষা দিলেই পার্তিস। যাক সে সব কথা, এখন কি কর্বি ঠিক কর্লি?'

বলিলাম, 'B.Sc. পড়ব। তুই?'

বলিল, 'ভাবছি এবার পালাব।'

হাসিয়া বলিলাম, 'কোথায় রে?'

'জাহান্নামে।'

কালীধন আমার সঙ্গেই ছিল। সে বলিল, 'তারজন্যে তাড়াতাড়ি করার কোন প্রয়োজন নেই।'

আমি বলিলাম, 'পড়বি না নাকি?'

ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, 'বাবা ত পড়তে বলছেন।'

বলিলাম, 'ভালইত—পড় না। যদি B.Scটায় চেষ্টা করে ভাল result করিস—'

বাধা দিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, 'ঐ অনুরোধটা আর করিসনে অরুণ। জীবনের অমূল্য সময়টা মিছিমিছি পড়াশোনা করে কোন লাভ নেই।'

বলিলাম, 'পড়াশোনাটাও মিছিমিছি হল?'

বলিল, 'নয়ত কি? কি কর্ব পড়ে? M.Sc. পাশ কর্ব? তারপর?'

বলিলাম, 'তারপর আর কি কোন কাজ নেই?'

হাসিয়া বলিল, 'আছে বইকি। একটা ভাল চাকরী কর্ব, একটি লালটুকটুকে বৌ আনব বাপমাকে নাতির মুখ দেখাবার জন্য। প্রতিবছর একটা করে রুগ্ন ছেলের বাপ হয়ে চরিত্রবান ছেলে বলে নাম কিনব আর কেউ কোন কথা বল্লে ভগবানের দোহাই পাড়ব। বিয়ের পরের বছর থেকে আফশোষ কর্তে থাকব, বন্ধুর বউয়ের রূপের প্রশংসা কর্ব, বন্ধুর বউকে নিয়ে সিনেমা যাব—'

খেয়ালের মাথায় আরও কত কি যে সে বলিত তার ঠিক নাই। কোন রকমে তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলাম, 'বেশ তা না হয় না কর্লি, কিন্তু কর্বিটা কি শুনি?'

উদাসকণ্ঠে বলিল, 'Vagabondising.'

বলিলাম, 'Vagabondising!'

বলিল, 'হ্যাঁ ঘুরে বেড়াব—'

বলিলাম, 'কতদিন?'

'যতদিন পার্ব, যতদিন ক্ষমতা থাকবে ততদিন।'

হাসিয়া বলিলাম, 'যখন শক্তি ফুরিয়ে যাবে, তখন?'

ওষ্ঠপ্রান্ত বিকৃত করিয়া বলিল, 'তখন? তখন এই—' বলিয়া জিহ্বা এবং তালুর সাহায্যে একটা আওয়াজ করিয়া মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতের

তর্জ্জনীটা প্রসারিত করিয়া নিজের গলার কাছে বারকয়েক সমান্তরালভাবে নাড়াইয়া, ইঙ্গিতে জানাইয়া দিল যে সে আত্মহত্যা করিবে।

কথাটা তাহার মুখে নতুন শুনিলাম না। বলিলাম, 'সে সবত পরে হবে। কলেজে ভর্তি হবি কিনা তাই বল?'

বলিল, 'দেখি।'

শেষপর্যন্ত অনল কলেজে ভর্তি হইল এবং বেশ মনোযোগ দিয়া কয়েক মাস পড়াশোনা করিল। 3rd yr হইতে 4th yrএ উঠিবার সময় যথেষ্ট ভাল রেজাল্ট করিল। আমার পাশে বসিয়াই পরীক্ষা দিয়াছিল। কোন অসৎ উপায় অবলম্বন করে নাই। এমন কি আমাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই।

বলিলাম, 'এইত দেখছিস্ একটু মন দিলে তুই কত ভাল রেজাল্ট কর্তে পারিস?'

বলিল, 'আর ওসব কথাগুলো বলিসনে অরুণ, ভাল লাগে না।'

আহত হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

অনল বলিল, 'রাগ কর্লি?'

মুখ ভার করিয়া বলিলাম, 'না রাগ কর্ব কেন?'

সশব্দে আমার গালে একটা চুম্বন করিয়া বলিল, 'দূর্ পাগ্লা।'

আমায় চুম্বন করাটা অবশ্য এমন কিছু দোষণীয় নহে। তবু বহু লোকজনের মধ্যে চুম্বন করিতেই বিরক্ত হইয়া বলিলাম, 'কি ছেলেমানুষী করিস্?'

কলেজের ছাত্রদের মধ্যে কে একজন বলিয়া উঠিল, 'বেশ, বেশ, বড় আনন্দ হল!'

অনল চকিতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'চুমুটা কিন্তু আপনাকে খাইনি।'

কথাটা বলিবার ভঙ্গী শুনিয়া ছেলেটার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া গেল। মনে মনে প্রমাদ গণিয়া অনলের হাত ধরিয়া তাড়াতাড়ি নিকটস্থ চায়ের দোকানে টানিয়া লইয়া গেলাম।

তখন 4th yearএ পড়িতেছি। একদিন দক্ষিণ কলিকাতায় একটি রাস্তায় বাসের জন্য দাঁড়াইয়া আছি, হঠাৎ একখানা বিরাট গাড়ী প্রায় আমার গায়ের উপর আসিয়া পড়িতেই লাফাইয়া ফুটপাতে উঠিয়া পড়িলাম, এবং ড্রাইভারটিকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য কিছু বলিবার পূর্বেই পিছন দিককার জানালা দিয়া একখানি মুখ বাহির হইয়া আসিল। দেখি অনলের বান্ধবী বেলা দত্ত। বলিল, 'অরুণবাবু শুনুন।' দুই পা আগাইয়া গাড়ীর কাছে দাঁড়াইতেই দরজাটা খুলিয়া বেলা আমায় ভিতরে আহ্বান করিল। অতর্কিত আহ্বানে বিব্রত হইয়া পড়িলাম। কারণ প্রথমতঃ বেলার সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিল না। দ্বিতীয়তঃ অনল সঙ্গে নাই; সে থাকিলে ভাবনার কোন কারণ ছিল না। মেয়ে মহলে নেহাৎ 'ভালছেলে' হিসাবে যেটুকু মর্যাদা আমার প্রাপ্য তাহার দ্বারা সেখানে সুখ্যাতি অর্জন করা যায় না। এবং মেয়েমহলে খ্যাতি লাভ করিবার মত আমার কিছুই ছিল না। তাই বেলার আহ্বানে ইতঃস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া বেলা বলিল, 'ভিতরে আসুন অরুণবাবু! একটু দরকার আছে আপনার সঙ্গে।'

ইতিমধ্যে আশেপাশের লোকজন উঁকি মারিতে সুরু করিয়াছে। অতএব আর দেরী করা সঙ্গত নয় মনে করিয়া ইষ্টদেব স্মরণ করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ীর ভিতরে আরও একজন বসিয়াছিল। গাড়ীর আলোয় তাহাকে চিনিলাম। সে শিখা।

কোনরকমে জড়-ভরতের মত তাহাদের দুইজনের মধ্যে বসিয়া পড়িলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। শিখা রাস্তার দিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। বেলাও নীরব। মনে মনে অস্বস্তি অনুভব

করিতে লাগিলাম। অথচ কি যে বলিব ভাবিয়া পাইলাম না। সহসা বেলা নীরবতা ভঙ্গ করিল।

বলিল, 'আপনার বন্ধুটি কোথায়?'

বুঝিলাম অনলের কথা হইতেছে। বলিলাম, 'কলকাতাতেইত আছে।'

বেলা বলিল, 'ও, আমরা ভাবলাম বুঝি নিরুদ্দেশ হয়েছে।'

হাসিয়া বলিলাম, 'না এখনও হয়নি। তবে হবে বোধ হয় শীঘ্রই।'

বেলা কথাটা শুনিয়া যেন চমকাইয়া উঠিল। বলিল, 'তার মানে?'

বলিলাম, 'মানে কিছুই নয়। ওর মাথাটা একটু খারাপ আছে জানেন ত। মাঝে মাঝে বলে—'আর বেশীদিন নয় এবার সব শেষ করে দেব।'

বেলা অধিকতর ব্যাকুল হইয়া বলিল, 'বলে নাকি?'

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, 'বলে। প্রায়ই বলে।'

বেলা কিছুটা বিচলিত হইয়া বলিল, 'আপনারা কিছু বলেন না কেন?'

তাহাকে বিচলিত হইতে দেখিয়া বলিলাম, 'সে কি আর সত্যিই আত্মহত্যা কর্তে যাচ্ছে যে তাকে বাধা দেব?'

বেলা অন্যমনস্কের মত বলিল, 'আপনার কথাই যেন সত্যি হয়। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন, ও-ঠিক আত্মহত্যা কর্বে?'

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'আপনার এরকম মনে হওয়ার কারণটা কী?'

বেলা বলিল, 'কারণ? কারণ কি ঠিক জানি না, তবে যতটুকু অনলকে বুঝেছি তাতে মনে হয় ও সাধারণ পাঁচজনের সমগোত্রীয় নয়। ওর জাত আলাদা।'

অনলের নিজের মুখে আত্মহত্যার কথা শুনিলে আমারও সন্দেহ

হইত। কিন্তু প্রাসাদনগরীর কোলাহলমুখর রাজপথের উপর দিয়া সশব্দে গাড়ী করিয়া যাইতে যাইতে একটি শিক্ষিতা তরুণীর মনের বিকার লক্ষ্য করিয়া হাসি পাইল। মনে হইল তাহার পক্ষে অনলের জন্য ব্যস্ত হওয়া নিরর্থক। কিন্তু তাহা লইয়া আর কোন কথা বলিলাম না।

বেলা আবার প্রশ্ন করিল, 'অনলকে একদিন দেখা কর্তে বলবেন আমার সঙ্গে ?'

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'বলব।' বিস্মিত হইলাম এই জন্য যে, অনল যে আর বেলাদের বাড়ী যায় না এই সংবাদ আমার জানা ছিল না। অবশ্য এসম্বন্ধে অনলকে কোন প্রশ্নও করি নাই। তবে ইদানীং অনলের প্রথম সঙ্গীদলের কথাবার্তা শুনিয়া মনে হইত অনল তাহার বান্ধবীদের সহিত আবার ঘনিষ্ঠতা করিতে সুরু করিয়াছে। কানাঘুষায় যেটুকু শুনিয়াছিলাম তাহা অনলের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নহে। তবুও সে সমস্ত কথা লইয়া অনলের সঙ্গে কোন আলোচনা করি নাই। কারণ তাহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যতটুকু পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহাতে এইটুকু বুঝিয়াছিলাম যে সে যাহাই করুক না কেন, এমন কোন কাজ করিবে না যাহাতে তাহার আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে হয়। তাহার সমস্ত কার্যকলাপ আপাতদৃষ্টিতে যতই অসংযত এবং উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া মনে হউক না কেন, সেই সমস্ত কার্যকলাপের জন্য অপরাধ তাহার একার নহে। কিন্তু গত কয়েকদিনের মধ্যে অনল যে তাহার বহু আলোচিত বান্ধবীদের সহিত আদৌ দেখা করে নাই, এই সংবাদটা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম যথেষ্ট। কারণ সংবাদের মধ্যে নতুনত্ব ছিল অনেকখানি। একবার মনে হইল, প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লই যে অনল কতদিন যাবৎ আসে নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে কেমন যেন লজ্জাবোধ করিলাম। বেলা দত্ত অনর্গল কথা বলিয়া যাইতে লাগিল, এবং সে যে কি বলিতেছে না

বলিতেছে তাহা কিছুই না শুনিয়া নির্বিকার চিত্তে হ্যাঁ-না প্রভৃতি জবাব দিয়া ভদ্রতা রক্ষা করিয়া চলিলাম। হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল বেলার একটি খাপছাড়া প্রশ্নে। বলিল, 'আচ্ছা অনলের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে?'

চমকিত হইয়া বলিলাম, 'কই তেমন কথা ত কিছু শুনিনি?'

বেলা বলিল, 'শোনেন নি, না বলতে চান না?'

বলিলাম, 'তার বিয়ের ব্যাপারটা গোপন করার মত কোন সঙ্গত কারণ দেখতে পাইনে। তা ছাড়া তার বিয়ের সংবাদটা আমার পক্ষে সুখবর—অতএব সেটা আমি জানলে আনন্দের আতিশয্যে নিশ্চয়ই বলে ফেলতাম।'

বেলা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'অনলের বিয়েটা আপনার পক্ষে সুখবর কেন?'

বেলার কথায় যে তাহার ব্যাকুলতা এবং বেদনাজড়িত প্রচ্ছন্ন বিরক্তির আভাস ছিল তাহা বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলাম, 'কেন কি করে বলব? তার বিয়ে হলে খুশী হই। ছেলেটার বহুগুণ আছে; যদি বিয়ে করে তাহলে অনেক অন্যায়ের হাত থেকে সে নিজেকে রক্ষা কর্ত্তে পারবে।'

বেলা অন্যমনস্কের মত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'হু।'

আমি নির্ব্বোধের মত বলিয়া যাইতে লাগিলাম, 'ছেলেটা জীবনে কোনদিন শান্তি পায়নি। আমি ত ওকে জানি ছেলেবেলা থেকেই—ওর ভিতরে কি যে একটা অদ্ভুত শক্তি কাজ কর্ছে, যার জন্য সে এক মুহূর্ত্তও স্থির হয়ে থাকতে পারে না। তা ছাড়া—'

বাধা দিয়া বেলা বলিল, 'অনলের সঙ্গে আপনার খুব বেশী রকম বন্ধুত্ব, তাই না?'

তার প্রশ্নের কোন হেতু খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলাম, 'তার বন্ধু হবার মত যোগ্যতা আমার কই? বাস্তব জগতে সর্ব বিষয়ে সে

আমার চেয়ে ঢের বেশী অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছে। সুতরাং তার বন্ধু হওয়া আমার মত সাধারণ মানুষের কাজ নয়।'

বেলা বলিল, 'আপনি তা হলে অনলকে খুব বেশী রকম ভালবাসেন দেখছি?'

তাহার কথা শুনিয়া হাসি পাইল। মনে হইল যে মানুষ গৃহাভ্যন্তরের সমস্ত সুখ শান্তি বিসর্জন দিয়া স্বেচ্ছায় দুঃখের পথ বাছিয়া লইয়াছে তাহাকে ভালবাসিবার মত স্পর্দ্ধা আমার কি করিয়া সম্ভব হয়। যে অগণিত মানুষের মধ্যে অনুক্ষণ থাকিয়াও অবকাশ মুহূর্ত্তে অকপটে স্বীকার করে 'I feel very lonely whithin my heart' —অর্থাৎ অন্তরের মধ্যে যে মানুষ সর্বক্ষণ নিজেকে একাকী বলিয়া অনুভব করে, তাহার মত মানুষের বন্ধু বলিয়া নিজেকে অভিহিত করিতে যথেষ্ট সংশয় জাগে!

বলিলাম, 'ভালবাসলেই কি সব হয়? অনলকে সকলেই ভালবাসে। সে যেখানে যাবে সেইখানেই ভালবাসা পাবে মানুষের কাছে। অতএব তাকে ভালবাসা কিছু নূতন নয়।'

বেলা বলিল, 'আপনার কি মনে হয় সে কোন মেয়েকে ভালবাসে?'

বেলার প্রশ্নের মধ্যে নারীসুলভ অনুসন্ধিৎসার স্পষ্ট আভাস পাইয়া বিরক্ত হইলাম।

বলিলাম, 'আমার ত মনে হয় না সে আজ পর্যন্ত কোন মেয়েকে ভালবেসেছে। বরং মনে হয় ভালবাসার মত নির্বোধ সে নয়।'

আমার কথা শুনিয়া বেলা যেন জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, 'ভালবাসাকে আপনি নির্বুদ্ধিতা বলেন?'

বলিলাম, 'আমি কিছুই বলি না। সে বলে। কথাটা তারই মুখে শোনা।'

শিখা চকিতে একবার আমাদের দিকে চাহিয়া পরক্ষণেই মুখ ফিরাইয়া লইল।

বেলা বিস্মিত স্বরে বলিল, 'ও কি তাই বলে নাকি?'

বলিলাম, 'মাঝে মাঝে সে বলে বটে।'

বেলা বলিল, 'আপনি কি বলেন?'

তাহার প্রশ্নের উত্তর দিবার ইচ্ছা না থাকায় বলিলাম, 'অমি এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাইনি কখনও।'

বেলা একটু হাসিল। সেই হাসির মধ্যে অনেকখানি বিদ্রূপই যে আত্মগোপন করিয়াছিল তাহা উপলব্ধি করিয়া আহত স্বরে প্রশ্ন করিলাম, 'আপনি হাসলেন যে?'

সহাস্যে মাথা নাড়িয়া বেলা বলিল, 'এমনি!' পরক্ষণেই বলিল, 'আপনাকে কিন্তু ধরে নিয়ে যাচ্ছি একটু উদ্দেশ্য নিয়েই।'

বলিলাম, 'উদ্দেশ্য বিহীন কাজ মেয়েরা করে না—তা জানি।'

বেলা সকৌতুকে বলিয়া উঠিল, 'এই ত মেয়েদের সম্বন্ধে বেশ মন্তব্য করেন দেখছি। তবে যে বল্লেন—'

বাধা দিয়া বলিলাম, 'মাপ কর্বেন। কথাটা আমার নিজের নয়। অনলের কাছ থেকেই শিখেছি।'

বেলা বলিল, 'তা হলে আপনার মত ভালছেলেকেও অনলের কাছে, কিছু কিছু শিখতে হয়?'

সপ্রতিভ ভাবেই বলিলাম, 'হয় বৈকি? ব্যবহারিক জীবনের গতিভঙ্গীর সঙ্গে আমি সবিশেষ পরিচিত নই। এবং এ সম্বন্ধে অনলের সাহচর্য আমার পক্ষে যে যথেষ্ট লাভজনক এ কথাটা স্বীকার কর্তে আমি কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করি না বেলা-দেবী।'

বেলা আমায় আঘাত করিতে না পারিয়া বলিল, 'এরকম বন্ধুপ্রীতি এযুগে দুর্লভ।'

ধীর কণ্ঠে বলিলাম, 'হবে হয়ত!'

কথা কহিতে কহিতে গাড়ী আসিয়া বেলাদের বাড়ীর গেটে ঢুকিল।

বলিলাম, 'কোথায় চলেছি বলুন ত?'

পরিহাস রসিক বেলা বলিল, 'ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমরা ত সংখ্যায় মোট দু'জন মেয়ে—'

তাহার কথার ভঙ্গী শুনিয়া হাসিয়া বলিলাম, 'আপনারা সংখ্যায় দুজনই হন আর দশজনই হন তাতে কিছু এসে যায় না—'

বেলা মাথা নাড়িয়া বলিল, 'হল না। বন্ধুর কাছে কিছুই শেখেন-নি দেখছি। অনল হলে কি বলত জানেন? বলত মেয়েরা একাই একশ—অর্থাৎ একশটা ছেলের মাথা খাবার পক্ষে একটা মেয়েই যথেষ্ট।'

বেলার কথার উত্তরে কিছু বলিবার পূর্বেই গাড়ী থামিল গাড়ী-বারান্দার নীচে। দরজাটা খুলিয়া নামিলাম। সত্য কথা বলিতে কি গাড়ীতে উঠিবার সময় যতখানি সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা শতগুণ বেশী সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলাম গাড়ী হইতে নামিয়া। কেবলই মনে হইতে লাগিল, কি কুক্ষণেই না বেলার সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম। কিন্তু সে সমস্ত কথা চিন্তা করা অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইল।

বেলা গাড়ী হইতে নামিয়া আমায় বলিল, 'আপনি মনে মনে রাগ কর্চ্ছেন হয়ত? কিন্তু কি কর্ব বলুন? আপনাকে আমার বিশেষ দরকার?

বলিলাম, 'তাত বুঝলাম। কিন্তু দরকারটা কি রকম তা না বুঝতে পারলে অসুবিধায় পড়তে হয় যে!'

বেলা সহসা হাত বাড়াইয়া আমার ডান হাতটা প্রায় ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, 'কিছু অসুবিধা হবে না। চলুন—আয় শিখা।'

শিখার উপস্থিতি এতক্ষণ বিস্মৃত হইয়াছিলাম। বেলার আহ্বানে শিখা নামিয়া আসিতেই, অনিচ্ছাসত্ত্বেও শিখার প্রতি চাহিলাম। দেখি তাহার মুখ চোখ অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর—এবং কেন জানি না তাহার অস্বাভাবিক মুখচ্ছবির মধ্যে সহসা যেন এক অপরূপ মাধুর্যের স্পষ্ট আভাস দেখিতে পাইয়া মুহূর্ত্তের জন্য তাহার প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল। কিন্তু তাহার মুখের ভাবে কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম না। মনে হইল সে যেন বড় বেশী গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। অবশ্য গাম্ভীর্য তাহাকে মানায়—।

বেলা বলিল, 'উপরে চলুন।' অগত্যা উপরেই যাইতে হইল।

প্রথমেই বলিয়াছি নারীদের সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। তাই তাহাদের হৃদয়ঘটিত কোন গোলযোগের কোন অর্থ বা হেতু কোনদিন নির্ণয় করিতে পারি নাই। ভাল ছেলে বলিয়া নহে, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার মত বুদ্ধির একান্ত অভাব ছিল বলিয়াই পারি নাই। ফলে বিবাহোত্তর জীবনে গৃহিনীর হস্তেও আমায় কম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। মাঝে মাঝে তাহার অভিমানাহত চিত্তের নির্দ্দোষ মন্তব্য শুনিয়াছি, 'তুমি মানুষটা যেন কেমন।' কিন্তু কোন জবাব দিতে পারি নাই। কারণ জবাব দিবার মত কোন কথা আমার জানা ছিল না। অতএব এই নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে নিজে বহু ধিক্কার দিয়াছি, কিন্তু কিছু ফল হয় নাই। এই নির্বুদ্ধিতা আমার চিরদিনের। তাই ব্যবহারিক জীবনে আপন অধ্যবসায় এবং উদ্যমের সাহায্যে চিরদিনই ভাল ছেলে বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছি, কিন্তু কোনদিনই মানুষের পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারি নাই। যতবারই নিজের এই অক্ষমতা দূর করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি ততবারই অত্যন্ত অসহায়ের মত উপলব্ধি করিয়াছি যে সেই শক্তি আমার নাই। এই অক্ষমতার জন্য ছাত্র জীবনের বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিরুপায় হইয়া যাহার

শরণাপন্ন হইয়াছি, সে অনল। সর্ব্ববাদিসম্মত সেই অপদার্থ ছেলেটি যে মানুষের মনের বহু গূঢ়তম প্রশ্নের জবাব এমন নিপুন ভাবে এবং অসঙ্কোচে কেমন করিয়া দিত জানি না ; কিন্তু বেশ বুঝিতাম যে পাঠ্য-পুস্তকের তালিকার বাহিরে যে বিচিত্র জগৎ রহিয়াছে তাহার অবস্থিতি এবং গতিবিধির সঙ্গে সেই অপদার্থ ছেলেটি বিশেষ ভাবে পরিচিত। সেই বিচিত্র জগতে তাহার স্থান আমার অনেক উপরে। তাহার এই প্রাধান্য সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিয়া লইতে কিছুমাত্র ইতঃস্তত করি নাই। তাহার অনুপস্থিতিতে সাধারণতঃ মেয়েদের সঙ্গ এড়াইয়া চলিতাম। কারণ, কখন যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়, সেই সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমার ছিল না। তাই সেদিন অতর্কিতে পথের মধ্যে বেলার আহ্বানে তাহার সঙ্গ গ্রহণে বাধ্য হইয়া দুর্ভাবনার আর অন্ত ছিল না। এবং দুর্ভাবনা চরমে উঠিল তখন, যখন বেলা পরম সমাদরে তাহাদের দ্বিতলের হলঘরে লইয়া গিয়া জলযোগ ইত্যাদির দ্বারা সহজ ভদ্রতা রক্ষা করিয়া সহসা প্রশ্ন করিল, 'আচ্ছা অরুণবাবু, আপনি অনলের সঙ্গে কতদিন মিশছেন ?'

প্রশ্নের জবাবটা নেহাৎই সহজ মনে করিয়া কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া নির্ভুল হিসাব বলিয়া দিলাম। কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝিলাম অমন নির্ভুল হিসাব দেওয়াটা নিতান্তই অনুচিত হইয়াছে। কারণ বেলার দ্বিতীয় প্রশ্ন শুনিয়া উত্তর দিবার মত কথা খুঁজিয়া পাইলাম না।

বেলা বলিল, 'অনলের সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয় ?'

বেলার প্রশ্ন নিতান্তই সরল এবং তাহার উত্তরটাও হয়ত তেমনি সরল ছিল। কিন্তু ঐ যে বলিয়াছি আমার অনভিজ্ঞ মন সহসা কোন প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়াই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইত। সেদিন বেলার প্রশ্ন শুনিয়া নির্বোধের মত বলিলাম, 'তার মানে ?'

বেলা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিল, 'মানে অনলকে আপনার কি রকম

লাগে? তাকে ত অনেকদিন থেকেই দেখছেন? কি রকম ছেলে সে?'

তাহার এই প্রশ্নের কি জবাব দিব ভাবিয়া পাইলাম না। যদিও জবাব দিবার মত অনেক কিছুই বলিবার ছিল। বিশেষতঃ যাহাকে ভালবাসি তাহার সম্বন্ধে গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিবার মত দুর্বুদ্ধি কোনদিনই হয় নাই। কারণ ভাল লাগে ইহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে হইত, কেন লাগে অথবা ভাল লাগার পরিমাণ কতখানি এই সমস্ত চিন্তা নেহাৎই অবান্তর বলিয়া মনে হইত। তাই বেলার প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম, 'অনলের সঙ্গে অনেকদিন মিশছি বটে; কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ভাবিনি কখনও?'

বেলা তেমনি অধীর হইয়া বলিল, 'তার মানে আপনি চান না যে তার কথা নিয়ে আপনার সাথে আমি আলোচনা করি?'

বেলা আমার কথায় বিকৃত অর্থ করিতেছে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, 'না—না—আপনি ভুল বুঝছেন। আমি বলছি—'

বেলা আমার কথায় কোন কর্ণপাত না করিয়া বলিল, 'আমি সবই বুঝি অরুণ বাবু। তার মুখে আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনে ভেবেছিলাম আপনি বুঝি সত্যিই সাধারণের দল ছাড়া। কিন্তু এখন দেখছি অনল আপনার সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা কথা বলে গেছে।'

বেলার কথা শুনিয়া বিস্মিত নেত্রে তাহার পানে চাহিলাম। অনল আমার সম্বন্ধে তাহার কাছে কি যে বলিয়াছে এবং তাহার কত খানি যে মিথ্যা, তাহা বুঝিতে না পারিয়া যতখানি বিস্মিত হইয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা বেশী বিস্মিত হইয়াছিলাম বেলার অহেতুক অসহিষ্ণুতা এবং তাহার আচরণের তিক্ততা দেখিয়া।

নিজের সম্বন্ধে কোনদিনই বিশেষ উচ্চ ধারণা আমার ছিল না। কখনও নিজেকে সাধারণ মানুষ হইতে উচ্চ আসন দিই নাই অথবা

সাধারণের দল ছাড়া বলিয়াও মনে করি নাই। তাই তাহা লইয়া কোন অভিমানও ছিল না। সেইজন্য বেলার কথায় আহত হইলাম না বটে কিন্তু অকারণে আমার প্রতি তাহার বিরক্তির কোন হেতু খুঁজিয়া না পাইয়া মনে মনে বিচলিত হইয়া পড়িলাম। বেলার আচরণ নিতান্ত অসঙ্গত ও অশোভন বলিয়াও মনে হইল। কি ঘটিয়াছে কিছু বুঝিতে না পারিয়া সে অবস্থায় কি করা উচিত তাহা ভাবিয়া পাইলাম না।

বেলা বলিল, 'আপনি ভাবছেন আপনি সব কথা চেপে যাবেন। কিন্তু আপনিও জেনে রাখুন যে আমিও অনেক খবর পেয়েছি। তা নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা কাটাকাটি কর্তে চাই না; তবে আপনার বন্ধুটিকে বলে দেবেন, সে যেন এ বাড়ীতে আর কোন দিন না আসে।'

মানুষের মর্যাদা বলিয়া একটা বস্তু আছে যাহাতে আঘাত লাগিলে সংসারের নগণ্যতম মানুষও প্রতিবাদ জানায়। সেই বস্তুটা আমার ছিল কিনা তাহার পরীক্ষা ইহার আগে আর কখনও হয় নাই। কারণ স্বভাবতঃই আমি একটু মুখচোরা প্রকৃতির। কাহারও সহিত যাচিয়া আলাপ করা বা ঘনিষ্ঠতা করিবার মত শক্তিও আমার ছিল না। কিন্তু সেইদিন বেলার রূঢ় আচরণে আমার মর্যাদায় আঘাত লাগিল বলিয়াই মনে হইল।

তবুও নিজেকে সংযত করিয়া ধীরকণ্ঠে বলিলাম, 'কি ঘটেছে না ঘটেছে আমি কিছুই জানি না। আপনি কি বলতে চান তাও স্পষ্ট করে বল্লেন না। আমি স্বেচ্ছায় কোনদিন আপনাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কর্তে আসিনি। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন অনলকে আমি যথেষ্টই ভালবাসি। এবং তার কথা নিয়ে কারুর সঙ্গে কোন আলোচনা করায় মত মনোবৃত্তিও আমার নেই। অতএব সে সব কথা নিয়ে আমার কিছু বলার কোন অর্থ নেই। তাকে আমি আপনার চেয়েও ভাল করে চিনি।'

ভাবিয়াছিলাম আমার রূঢ় প্রত্যুত্তরে হয়ত বেলা চুপ করিয়া যাইবে ; কিন্তু ফল হইল বিপরীত। বেলা যেন ফাটিয়া পড়িল।

ব্যঙ্গ কঠিন স্বরে বলিল, 'চিনবেন বই কি? আপনিও যে সেই দলের।'

বেলার মুখের এই 'দল' কথাটির অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। তবুও ধীরকণ্ঠে বলিলাম, 'তা যদি হতে পারতাম, তাহলে হয়ত আজ আমায় এভাবে দাঁড়িয়ে কথা শুনতে হত না?'

বেলা বলিল, 'কেন মিথ্যে লুকোতে চাইছেন? অনলের চরিত্রের কলঙ্ক কারুরই জানতে বাকী নেই।'

অবাক হইয়া গেলাম। কোন্ কথা হইতে কোন্ কথা আসিয়া পড়িল। অনলকে ভালবাসিতাম সত্যই ; কিন্তু সেই ভালবাসা কত গভীর তাহা জানিতাম না। বোধ করি জানিবার প্রয়োজন হয় নাই বলিয়াই জানিতাম না। কিন্তু বেলা যখন ব্যঙ্গ কঠিন কণ্ঠে তাহার চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করিল, তখন আর নিজেকে সংযত রাখিতে পারিলাম না। সহসা উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, 'তার চরিত্রের অপবাদ দেবার আগে নিজেদের কথাটা ভেবে দেখবেন।' বলিয়া বেলাকে আর কোন কথা বলিবার কিছুমাত্র সুযোগ না দিয়া ঝড়ের বেগে বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

বাড়ীর বাহিরে আসিয়া মনটা যেন অনেকখানি স্বস্তি পাইল। এবং দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিলে মানুষের মনে যেমন কিছুটা গ্লানি কিছুক্ষণ পীড়া দেয়, ঠিক তেমনি বেলার সহিত কথাবার্তার সূত্র ধরিয়া নিজের মনের মধ্যে অপরিচিত গ্লানি জমিয়া অতিশয় পীড়িত করিয়া তুলিল। বিশেষ করিয়া বেলার প্রতি আমার নিজের আচরণটাও কেমন যেন অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আমিও যে এমন করিয়া আঘাতের পরিবর্তে আঘাত করিতে পারি, এই তথ্যটা আমার

জানা ছিল না। বিশেষতঃ কোন স্বল্প পরিচিতা নারীকে যে এমনি করিয়া মর্ম্মান্তিক কথার দ্বারা বিদ্ধ করিতে পারি, তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই।

বেশ কিছুক্ষণ জনবিরল রাস্তায় চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া আসিবার জন্য পা বাড়াইতেই নারীকণ্ঠের আহ্বান শুনিলাম, 'অরুণবাবু।'

বিরক্ত হইয়া পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখি শিখা দাঁড়াইয়া আছে। শিখাকে দেখিয়াই মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম। ভাবিলাম সে-ও বুঝি কিছু কথা শুনাইতে আসিয়াছে। বলিলাম 'কি, বলছেন কি?'

শিখা আমার অত্যন্ত কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া এক মুহূর্ত্ত ইতঃস্তত: করিয়া বলিল, 'আমায় ভুল বুঝবেন না অরুণবাবু। আমি কিন্তু এসবের কিছুই জানতাম না।'

শিখার কণ্ঠস্বরে কি যে ছিল জানি না। মনে হইল যেন তাহার চশমার নীচে চোখ দুইটি জলভারে ছলছল করিতেছে। ইহারও কোন কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। নারীর চোখের জল দেখিতে মোটেই অভ্যস্ত ছিলাম না; তাই তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, 'না—না—আপনার সম্বন্ধে কিছু ভাবিনি—' বলিতে বলিতে দ্রুতপদে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলাম।

পরদিনই অনলের বাড়ীতে গিয়া তাহাকে সব কথা খুলিয়া বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম কি ঘটিয়াছে। প্রত্যুত্তরে সে উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল। একেই ত গত সন্ধ্যাবেলার আচরণে অপমানিত বোধ করিয়াছিলাম, তাহার উপর আমার গাম্ভীর্যের প্রত্যুত্তরে অনলকে হাসিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলাম, 'কি যে হাসিস তুই সব সময় বুঝি না। কি হয়েছে বল না?'

আমার বিরক্তি লক্ষ্য করিয়া সে যেন আরও উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল, 'তুইও চটে গেছিস?'

বলিলাম, 'এতে আনন্দিত হবার মত কিছু আছে বলে ত মনে হয় না।'

অনল বলিল, 'Bravo ! bravo ! তা তুই ফট্ করে বলে দিলি যে 'নিজেদের কথাটা ভেবে দেখবেন।'

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, 'বল্লাম বই কি ?

অনল বলিল, 'তুইও ত কম নস্।' বলিয়া আবার হাসিয়া উঠিল।

নিরুপায় হইয়া বলিলাম, 'তুই তা হলে বসে বসে হাসতে থাক্—আমি চলি।' বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম।'

অনল তৎক্ষণাৎ আমার হাতটা ধরিয়া বলিল, 'বস্ বস্, চটিস্ কেন ?—বলছি সব।'

বসিলাম। অনল বলিল, 'ব্যাপার কি হয়েছে জানিস্ ? বেলার মা আমায় সেদিন ধরেছে বেলাকে বিয়ে করার জন্য।'

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'তাই নাকি ? তারপর ?'

অনল একটা অশ্লীল মন্তব্য করিয়া বলিল, 'আমি বল্লাম যে বিয়ে করা সম্বন্ধে আমার নিজস্ব মতামতের কোন মূল্য নেই—তা ছাড়া বিয়ে যে কর্ব একথাও মনে হয় না।'

শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলাম, 'তারপর ?'

অনল সশব্দে টেবিলে চাপড় মারিয়া বলিল, 'তারপর আর কি ? তার মা বল্লেন, 'কেন মেয়েত আমার খারাপ নয়।' ভাবলাম বলি, 'ও মেয়ে নিয়ে লেকের ধারে স্ফূর্তি করা যায় কিন্তু বিয়ে করা যায় না।' কিন্তু তা আর বলিনি, বল্লাম, 'না মেয়ে খারাপের কথা হচ্ছে না, বিয়ে আমি কর্ব না।' শুনে ওর মা বল্লেন, 'তা হলে এইভাবে মেলামেশার মানে কি ?' মাইরী বলছি অরুণ একথা যে কোন মায়ের মুখ থেকে শুনব তা জানতাম না।' বল্লাম, 'মেলামেশাত অনেকের সঙ্গেই করি তাই বলে কি তাদের সকলকে বিয়ে কর্তে হবে নাকি ?'

ওর মা কথাটা শুনে খচে গেলেন। বল্লাম, 'বিয়ের কথাটা হঠাৎ আপনার মনে হবার কারণ কি?' বেলার মা বল্লেন, 'বেলা নিজে আমায় সব কথা বলেছে—' কথাটা শুনে এ্যায়শা হাসি পেল শালা কি বলব। বল্লাম 'মাপ্ কর্বেন; আমি কিন্তু এসব কথা একদম ভাবিনি। I cann't thik of marriage now' বলে সেখান থেকে কেটে পড়লাম। তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে ওর মা বোধ হয় ওকে সব কথা বলেছে।'

মুখ বিকৃত করিয়া বলিলাম, 'বেশ করেছে। মিছামিছি আমায় কতগুলি কথা শুনতে হল?'

সহসা আমার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'তাত হবেই—আমায় ভালবাসিস্ কেন?'

পাছে আরও কিছু অসভ্যতা করে এই ভয়ে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিলাম, 'ছাড়্ ছাড়্ কি করিস্?'

অনল বলিল, 'কিছুইত করিনি। কর্তে আর দিলি কই?'

ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, 'তোর সঙ্গে মেশাটাই আমার পাপ হয়েছে?'

অনল হাসিতে হাসিতে বলিল, 'প্রায়শ্চিত্তের এখনও যথেষ্ট সময় আছে—চেষ্টা করে দেখতে পারিস্? কিন্তু তোকে বেলা আমার দলের লোক বলে ভুল কর্ল কেন?'

বলিলাম, 'সে কথাটা বেলাকেই জিজ্ঞাসা করিস্?'

বলিল, 'তাই কর্ব।'

চকিত হইয়া বলিলাম, 'তুই কি আবার তাদের বাড়ী যাবি নাকি?'

বলিল, 'যাব না কেন? আলবাৎ যাব। আসল কাজই ত হয়নি।' বলিয়া পরিচিত ভঙ্গীতে হাসিয়া উঠিল।

তাহার মন্তব্যের অর্থ আমার কাছে মোটেই দুর্বোধ্য নহে। একটা

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। বুঝিলাম আর যাহাই হৌক্ বেলাদত্তের কুমারীত্ব এখনও অক্ষত আছে। বিস্মিত কণ্ঠে বলিলাম, 'সে কি রে? সে যে তোকে বারণ করেছে—বলেছে—'

বাধা দিয়া হাত নাড়িয়া বলিল, 'জানি, জানি। কিন্তু তুই জানিস্ না মেয়েরা যখন রাগে তখন যাকে তারা সবচেয়ে ভালবাসে তাকেই গালাগালি দেয়—এমন কি সময়ে সময়ে মারে—কিন্তু রাগ পড়ে গেলে কি থাকে জানিস্?'

আবিষ্টের মত বলিলাম, 'কি?'

দুই হাত দিয়া একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া বলিল, 'স্রেফ্ চোখের জল আর অভিমান। তখন চোখের জল মুছাতে হয় রুমাল দিয়ে আর অভিমান ভাঙ্গাতে হয় চুমু খেয়ে—kiss and cash—these are all that a woman wants in her life.'

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, 'তুই কি এক মুহূর্তের জন্যও serious হতে জানিস না অনল?'

কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া অনল বলিল, 'কে বলে আমি serious নই? আমি এত বেশী serious যে মানুষ আমায় মোটেই বিশ্বাস করে না?'

তাহার এই ধরণের রসিকতাগুলি আমি বরদাস্ত করিতে পারিতাম না। বলিলাম, 'ফাজলামি রাখ। অন্য কথা বল।'

অনল বলিল, 'আমার আর বলার কি আছে?'

সহসা নিতান্ত নির্বোধের মত প্রশ্ন করিলাম, 'আচ্ছা বেলার প্রতি তোর কি কিছুমাত্র মোহ নেই?'

অনল নিতান্ত ভালমানুষের মত মুখ করিয়া বলিল, 'বেলাকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালবাসি—সে না থাকলে পৃথিবীটা আমার কাছে একটা মরুভূমি।'

ইহাও তাহার রসিকতা বুঝিতে পারিয়া বলিলাম, 'দূর, তোর সঙ্গে কথা বলাই ভুল। আমি চলি—'

সহসা জামার পশ্চাৎ ভাগটা ধরিয়া ফেলিয়া অনল বলিল, 'যাস্ না যাস্ না, বলছি দাঁড়া।'

বিকৃত মুখে ফিরিয়া দাঁড়াইলাম।

অনল বলিল, 'কি বলছিলি আমি বেলাকে ভালবাসি কি না? না, বাসি না। তুই হয়ত বলবি—কেন? তার উত্তরে বলব, আমি কোন মেয়েকেই ভালবাসি না। এরও যদি কারণ জিজ্ঞাসা করিস্ তা হলে মুখ খারাপ কর্ব!'

পাছে সে সত্য সত্যই অশ্লীল গালাগালি করিতে সুরু করে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি তাহাকে নিরস্ত করিলাম।

বলিলাম, 'তবে ওর সঙ্গে মিশিস কেন?'

অনল বলিল, 'ওরা আমায় ডাকে বলে। বদনাম বাঁচিয়ে ভালবাসার সাধ মেটাতে ওদেরও ত সখ যায়। এবং সে কাজের জন্য আমার চেয়ে নির্ভরযোগ্য মানুষ আজও ওরা পায়নি?'

তাহার কথা শুনিয়া গা জ্বলিয়া গেল। মেয়েদের সম্বন্ধে এই ধরণের কুৎসিত মন্তব্য আমি সহ্য করিতে পারিতাম না। বহু বলিয়াও তাহার এই স্বভাব বদলাইতে পারি নাই।

একটু হাসিয়া বলিলাম, 'মেয়েদের সম্বন্ধে এর চেয়ে ভাল কিছু বুঝি ভাবতে পারিস্ না? ধর তোর যদি একটা ছোট বোন থাকত?'

নির্লজ্জের মত হাসিয়া জবাব দিল, 'আমার ছোট বোন হলে একটা নূতন কিছু হবে না কি? সে ও ত মেয়েমানুষই হবে।'

তাহার মুখে এই উক্তি শুনিয়া রাগে সর্ব্বশরীরে জ্বালা ধরিয়া গেল। এবং আর কোন কথা না বলিয়া এই কদর্য আবহাওয়া হইতে

আত্মরক্ষা করিবার জন্য দ্রুতপদে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলাম।

পরীক্ষা আগাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ ভালছেলেদের মত আমিও আমার পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া দুই বৎসরের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার শুভ উদ্দেশ্যে বহির্জগতের সহিত সকল সম্পর্ক প্রায় ত্যাগ করিলাম। অনলের সহিতও এইসময়ে বিশেষ দেখা সাক্ষাৎ হইত না।

পরীক্ষার মাস দুই আগে একদিন দুপুর বেলায় ঘরে বসিয়া পড়িতেছি হঠাৎ মা আসিয়া একখানা টেলিগ্রাম আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'দেখ ত কিসের টেলিগ্রাম, কোথা থেকে আসছে?'

অন্যমনস্কের মত টেলিগ্রামখানা খুলিয়া পড়িতেই মাথার মধ্যে সব ওলট পালট হইয়া গেল। নমিতা টেলিগ্রাম করিয়াছে। তাহার স্বামী অজিত মোটর দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হইয়া হাসপাতালে পড়িয়া আছে। এবং আমাদের কাহাকেও যাইতে লিখিয়াছে। পাছে সত্য কথা বলিলে কোন গোলমাল হয় এই ভয়ে বলিলাম, 'অজিতের কি অসুখ করেছে। নমিতা টেলিগ্রাম করেছে যাবার জন্য।'

মায়ের মন বোধ করি অজ্ঞাত বিপদাশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। বলিলেন, 'সে কিরে, কোন খবর পাই নি ত?'

বলিলাম, 'কি জানি।'

মা বলিলেন, 'তা হলে আজই তুই চলে যা। দেরী করিস্ নে। কি জানি কি হল আমার ত কেমন ভয় কর্ছে—হ্যাঁরে তেমন কিছু হয়নি ত?'

নীরবে মাথা নাড়িলাম। কথা কহিতে পারিলাম না। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় পাটনা রওনা হইলাম।

পাটনায় পৌছাইয়া ঠিকানা দেখিয়া বাড়ী বাহির করিতেই যথেষ্ট

সময় চলিয়া গেল। চার বছর নমিতার বিবাহ হইয়াছে। এই দীর্ঘ দিনগুলির মধ্যে নমিতা বহুবার আমায় পাটনা যাইবার জন্য লিখিয়াছিল। কিন্তু সময় করিয়া উঠিতে পারি নাই। কিছুক্ষণ ঘুরিবার পর গাড়ী আসিয়া একটা বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। নম্বর মিলাইয়া দেখি নমিতাদেরই বাড়ী বটে। গাড়োয়ানের ভাড়া মিটাইয়া ভিতরে ঢুকিলাম। এক তলাটা ফাঁকা, লোকজন নাই। সমস্ত বাড়ীটা কেমন যেন অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ বলিয়া মনে হইল। নমিতাকে ডাকিতে সাহস হইল না। কেবলই মনে হইতে লাগিল এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করা কোন মতেই উচিত নহে, এই স্তব্ধ বাড়ীটির গাম্ভীর্য নষ্ট করা উচিত নহে। সহসা বুকের মধ্যে একটা অপরিচিত সংশয় জাগিয়া উঠিল। হতভম্বের মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরপদে দ্বিতলে উঠিয়া আসিলাম।

সামনের ঘরটিতেই নমিতা বসিয়াছিল। সঙ্গে তাহার তিন বছরের শিশুপুত্র। আমার পায়ের শব্দে নমিতা মুখ ফিরাইতেই আমার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। প্রথমটা চিনিতে পারি নাই। চোখের সামনের সমস্ত আলো যেন নিভিয়া গেল। দেখি নমিতার পরণে সাদা থান কাপড়; সিন্দুরবিহীন শুভ্র সীমন্ত। আমায় দেখিয়া নমিতা একটু হাসিল। অদ্ভুত সে হাসি। অনেকটা মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর পাণ্ডুর ওষ্ঠের হাসির মতই তাহা ম্লান ও উদ্দেশ্যহীন।

বলিল, 'তুমি এসেছ। আমি জানতাম তুমিই আসবে। বড় দেরী হয়ে গেল। চল ঘরে চল।'

যন্ত্রচালিতের মত নমিতার কাঁধে একটা হাত রাখিয়া ঘরে আসিলাম। আবিষ্টের মত প্রশ্ন করিলাম, 'কি হয়েছিল?'

নমিতা বলিল, 'মোটরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফিরবার সময় কি করে জানি একটা ল্যাম্প-পোষ্টের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গাড়ীটা উল্টে যায়।

মাথায় লেগেছিল। হাঁসপাতালে যখন নিয়ে এল তখন জ্ঞান ছিল না। খবর পেয়ে গেলাম। সেদিন সারাদিন অজ্ঞান ছিলেন। রাত্রিবেলার একবার জ্ঞান ফিরেছিল। শুধু বল্লেন, 'আর বোধ হয় বাঁচব না—বড় কষ্ট—তোমার জন্য বড় দুঃখ হচ্ছে—' নমিতা চুপ করিল। তাহার দুই চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। এবং আমি সেই শোকাচ্ছন্ন স্তব্ধতার মধ্যে অসহায়ের মত বসিয়া রহিলাম। কোন কথাই বলিতে পারিলাম না।

নমিতার এই অবস্থা যে কোনদিন আমায় দেখিতে হইবে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। নমিতার শ্বশুর বা শ্বাশুরী কেহই জীবিত ছিলেন না। থাকিবার মধ্যে অজিতের একটা ছোট ভাই ছিল। সেও সুদূর পাঞ্জাবে কি যেন একটা চাকরী করে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাহাকেও টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল; কিন্তু সে এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই।

আবার একরাশ জিনিষপত্র বাঁধা-ছাদা করিয়া নমিতাকে সঙ্গে লইয়া ট্রেনে উঠিলাম। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বারবার চার বৎসরের পূর্বেকার দিনগুলির মধ্যে মনটা ফিরিয়া যাইতে লাগিল। তখনও নমিতার বিবাহ হয় নাই। বাড়ীর সকলের ছোট বলিয়া অত্যন্ত আদরের পাত্রী ছিল সে সকলেরই—বিশেষতঃ আমার। অতি শৈশব হইতেই তাহার বহু ঝঞ্ঝাট আমাকেই মিটাইতে হইয়াছে। সেও তাহা বুঝিত; তাই আমার উপরেই তাহার স্নেহের জুলুমটা কিছু বেশী হইত। ছেলেবেলায় তাহাকে কে কতখানি ভালবাসে প্রশ্ন করিলে সে তাহার ছোট দুইটি হাতের আঙ্গুল কয়টির সাহায্যে একে একে তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করিত। এবং সর্বশেষে আমার কথা উঠিলে তাহার দুইটি হাত যতদূর সম্ভব চালনা করা যাইতে পারে, ততদূর পর্যন্ত চালনা করিয়া তাহার প্রতি আমার স্নেহের পরিমাণটা সকলকে জানাইত। মনে পড়িতে

লাগিল বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে সে তাহার কুমারীচিত্তের গোপনতম বেদনা আমারই নিকট জানাইয়া জলভরা চোখে প্রতীকার প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সেই অতলস্পর্শী বেদনার কোন প্রতিকারই করিতে পারি নাই। তাহার কথা ভাবিতে ভাবিতে সহসা অনলের কথা মনে পড়িয়া গেল। চকিতের জন্য মনে হইল যে অনলের সহিত বিবাহ হইলে হয়ত এমনটি ঘটিত না। পরক্ষণেই মনে হইল ছি ছি এ সমস্ত কি ভাবিতেছি? তৎক্ষণাৎ অনলের চিন্তা মন হইতে মুছিয়া ফেলিলাম। মনে হইল চার বৎসর পূর্বে যখন বধূবেশে সজ্জিতা নবপরিণীতা নমিতা আমায় প্রণাম করিয়া নিঃশব্দে গাড়ীতে উঠিয়াছিল, তখন ক্ষণেকের জন্যও ভাবি নাই যে কিছু দিনের মধ্যেই তাহাকে এই বেশে এই ভাবে আমাকেই ফিরাইয়া আনিতে হইবে। কথাটা মনে হইতেই ভাবিলাম মানুষের জীবন, মানুষের আশা কত সীমাবদ্ধ। নিয়তির নির্ম্মম পরিহাস প্রতি মুহূর্তে কত মানুষের মুকুলিত আশা আকাঙ্ক্ষাকে চিরদিনের জন্য ধুলিসাৎ করিয়া দিতেছে। নিজের অজ্ঞাতসারেই চোখে জল আসিয়া গেল। নমিতার ছেলেটা আমার অসতর্কতার সুযোগে আমার পকেট হইতে সর্বস্ব বাহির করিয়া নিবিষ্ট মনে খেলা করিতেছে—নমিতা স্তব্ধ দৃষ্টিতে জানলার বাহিরে চাহিয়া আছে!

বাড়ী পৌছাইয়া নমিতাকে বাড়ীর ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া, চাকরকে মালপত্র নামাইতে বলিয়া চলিয়া আসিলাম। কারণ অজিতের মৃত্যুসংবাদ তখনও বাড়ীতে কেহই জানে না। টেলিগ্রাম খানি আমার কাছেই ছিল। সহসা নমিতাকে বিধবার বেশে দেখিয়া বাড়ীতে যে করুণ দৃশ্যের অবতারণা ঘটিবে তাহা দাঁড়াইয়া সহ্য করিবার মত শক্তি আমার ছিল না। উদ্‌ভ্রান্তের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে ঘুরিতে, অন্যমনস্কের মত অনলের বাড়ী গিয়া হাজির হইলাম। অনল

বাড়ীতেই ছিল। খবর পাইয়া নামিয়া আসিয়া স্বভাব-সুলভ প্রগলভের মত বলিল, 'কিরে! একি চেহারা হয়েছে তোর? আজকাল কি রাত্রে বাড়ীর বাইরে কোথাও থাকছিস্ নাকি?'

রসিকতায় হাসিবার মত মানসিক অবস্থা তখন আমার নহে।

বলিলাম, 'উপরে চল। বলছি।'

অনল যাইতে যাইতে বলিল, 'বাপরে! তুই যে বড় serious, তা হলে বোধ হয় প্রেমে পড়েছিস্?'

অনলের কাছে যে সহসা কেন আসিলাম জানি না। তাহার কাছে এই নিদারুণ দুঃসংবাদ যে কিছুই নহে তাহাও জানিতাম। সংবাদ শুনিয়া সে বড় জোর মৌখিক সহানুভূতি জানাইবে অথবা আমায় সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিবে। দুইটার কোনটারই আমার প্রয়োজন ছিল না। তবুও অনলের কাছে আসিলাম এই জন্য যে হঠাৎ যেন মনে হইল আজি এ শোকের দিনে তাহাকেই আমার একান্ত প্রয়োজন। কিসের সেই প্রয়োজন অথবা কেনই বা প্রয়োজন এ সমস্ত কথা ভাবিয়া দেখি নাই। অনলের কথাবার্তা শুনিয়া মনটা বড়ই দমিয়া গেল।

উপরের ঘরে আসিয়া অনলের পড়ার ঘরে বসিলাম। সে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, 'বল, কি বলবি?'

অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিলাম, 'নমিতার স্বামী অজিত মারা গেছে—মোটর দুর্ঘটনায়।'

কথাটায় পাছে তাহার সম্মুখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায় এই ভয়ে কণ্ঠস্বর যথা সম্ভব সংযত করিয়াই বলিলাম।

কথাটা শুনিবামাত্র অনল অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল, 'কি—কি বল্লি? নমিতার স্বামী মারা গেছে?'

তাহার এই অদ্ভুত বিচলিত অবস্থা দেখিয়া মনে মনে সত্যই আশ্চর্য হইয়া গেলাম। নমিতার সহিত তাহার আলাপ ছিল সত্য। কিন্তু সেই আলাপ যে শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌছাইয়া ছিল সে খবর বেচারী অনল জানিত না। জানিলে হয়ত এতখানি বিচলিত হইত না। কিন্তু কিছুই না জানিয়া তাহার এই অশোভন ব্যাকুলতা দেখিয়া আমি সত্যই হতভম্ব হইয়া গেলাম। আমার কথা তাহার অন্তরে যে কত গভীরভাবে আঘাত করিয়াছে তাহা বুঝিবার মত শক্তি আমার ছিল না।

অনল চেয়ার ছাড়িয়া জানলার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার সমস্ত মুখরতা যেন এক নিমেষে স্তব্ধ হইয়া গেল।

শান্তস্বরে বলিল, 'নমিতা এখন কোথায়?'

বলিলাম, 'আজই এসেছে কলকাতায়; আমি নিয়ে আসতে গিয়েছিলাম।'

অনল বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত বলিয়া উঠিল, 'নমিতা কলকাতায় এসেছে?' কথাটা বলিয়া পরক্ষণেই যেন তাহার সমস্ত উত্তেজনা সব চাঞ্চল্য নিঃশেষে মিলাইয়া গেল। উদাস কণ্ঠে বলিল, 'ওর শ্বশুরবাড়ীতে কেউ নেই বুঝি?'

বলিলাম, 'না শ্বশুর শ্বাশুড়ী কেউ নেই?

অন্যমনস্কের মত বলিল, 'হুঁ।'

বলিলাম, 'একদিন দেখা করিস নমিতার সঙ্গে।'

তীব্রকণ্ঠে অনল বলিয়া উঠিল, 'দেখা করব? নমিতার সঙ্গে? তুই কি পাগল হয়েছিস?' বলিয়া হাতের ইঙ্গিত করিয়া বলিল, 'সেদিন যাকে এইটুকু দেখেছি—ফ্রক পরা ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটি; গান শিখিয়েছি—আদর করেছি—আজ তাকেই বিধবার বেশে দেখবার জন্য যাব সৌজন্য দেখাতে? সে আমি মরে গেলেও পারব না। Impossible. উঃ!'

আজ অনলের আচরণ বড় বেশী বিসদৃশ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এত উচ্ছ্বসিত সে সাধারণতঃ হয় না। কিন্তু তাহা লইয়া কোন কথা বলিলাম না।

অনল যেন আপনার মনেই বলিতে লাগিল, 'মানুষের কি স্পর্দ্ধা! বলে বিধাতার সঙ্গে লড়াই কর্ব? বিধিলিপি পরিবর্তিত কর্ব? হায়রে দুরাশা—'

তাহার অসংলগ্ন কথার কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিলাম।

অনল ও আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, 'মানুষ নিজেকে খুব চালাক ভাবে নয়রে অরুণ?'

তাহার একথারও অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম, 'তার মানে?'

অনল হাসিয়া বলিল, 'মানুষ ভাবে সে বুঝি ইচ্ছা করলেই নিজের নিয়তির পরিবর্তন ঘটাতে পারে!—যেমন ধর—' কি একটা বলিতে গিয়া অনল নিজেকে সংযত করিয়া লইল। এবং কথার সূত্র হারাইয়া অন্যমনস্কের মত স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'নাঃ, থাক ওসব কথা। আজ তুই বাড়ী যা অরুণ। নমিতাকে বলিস—না থাক্ কিছু বলতে হবে না। যা বলার আমিই বলব, তুই যা।'

চেয়ার হইতে উঠিতে উঠিতে বলিলাম, 'তুই যাবি নাকি আমাদের বাড়ী?'

তেমনি অন্যমনস্কের মত বলিল, 'না।'

বলিলাম, 'তবে?'

অনল যেন যথেষ্ট বিরক্ত হইয়া বলিল, 'জানি না যা। তুই এখন যা অরুণ! আমার কিছু ভাল লাগছে না—তুই যা।'

তাহার কথায় আঘাত পাইয়াছিলাম সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা প্রকাশ করি নাই। কারণ জানিতাম অনলের কাছে সেই সব কথা প্রকাশ করিয়া বলা নিরর্থক। বাড়ী ফিরিবার সময় সারা পথটা কেবলই ভাবিয়াছি তাহার আজিকার আচরণের মধ্যে কোথায় যেন একটা বিরাট অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে।

পরীক্ষার দিন সাতেক আগে একদিন রাত্রে অনলের বাড়ী গিয়া হাজির হইলাম। অনলকে ডাকিবার উদ্যোগ করিতেই শুনিলাম অনলের পড়ার ঘর হইতে বাঁশীর সুর ভাসিয়া আসিতেছে। অনল বাঁশী বাজাইত তাহা জানিতাম। দুই চারিবার শুনিয়াছিও। কিন্তু বাঁশীর সুর যে এত করুণ, এত মধুর হইতে পারে তাহা যেন স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। মনে হইতে লাগিল যে বাদকের অন্তরের বহুযুগ সঞ্চিত বেদনার নিরুদ্ধ আবেগ সহসা চেতনা লাভ করিয়া বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে সকরুণ সুরে বাহির হইয়া এক অপূর্ব সঙ্গীত সৃষ্টি করিতেছে। সুরের সেই অপূর্ব মূর্ছনা যেন রাত্রির অন্ধকারের বুকে কিসের ব্যর্থ প্রত্যাশায় মুহুর্মুহু আঘাত করিয়া প্রতিধ্বনি তুলিয়া ফিরিতেছে। স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চাকরটাকে সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিলাম। ঘরের দরজা ভেজান ছিল। ঠেলিতেই খুলিয়া গেল। দরজা খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া চার বৎসর পূর্বেকার একটা কথা সহসা মনে পড়িয়া গেল। অনল মদ খাইতেছে। আমায় দেখিয়া বাঁশীটা নামাইয়া সস্মিতমুখে বলিল, 'আয়। আমি তোর জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। দরজাটা খিল দিয়ে বোস্।'

নীরবে সামনের চেয়ারটায় বসিলাম।

পরিপূর্ণ সুরাপাত্রে চুমুক দিয়া গভীর পরিতৃপ্তির সহিত বলিল, 'তারপর? নূতন খবর কিছু আছে নাকি?'

অপরিসীম ঘৃণায় এবং বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। আমার

মুখের চেহারায় যে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা অনলের সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল।

বলিল, 'খুব অবাক হয়ে গেছিস্, নারে অরুণ? কিন্তু কি কর্ব বল্, এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না।'

সহসা বুঝিতে পারিলাম না যে তাহার জীবনে এমন কি ঘটিয়াছে যাহার জন্য সে আবার মদ ধরিল। চিরকালই সে একটু অতিমাত্রায় খেয়ালী। চার বৎসর পূর্বেও তাহাকে একদিন এমনি এক অবস্থায় দেখিয়াছিলাম। তাহার পরে আর কোনদিন তাহাকে মদ খাইতে দেখি নাই। আজ হঠাৎ আবার তাহাকে এইভাবে মদের গেলাস লইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তাই বলিলাম, 'অবাক হওয়াটা কি স্বাভাবিক নয়?'

অনল কোন কথা বলিল না।

বলিলাম, 'এসব ত ছেড়ে দিয়েছিলি? আবার সুরু কলি কবে থেকে?'

অনল বলিল, 'মাত্র কদিন আগে থেকে।'

বলিলাম, 'হঠাৎ এ খেয়াল কেন?'

শিশুর মত হাসিয়া বলিল, 'খেয়ালী মানুষের খেয়ালের আবার কেন থাকে নাকি?'

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিলাম, 'কিন্তু গত কবছরের মধ্যে ত এরকম অদ্ভুত খেয়াল হয় নি?'

মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না। প্রয়োজন হয়নি।'

প্রশ্ন করিলাম, 'তবে আজ হঠাৎ প্রয়োজন হল কেন শুনি? অবশ্য আমার জানবার কোন অধিকার নেই। তবুও—'

তেমনি হাসিতে হাসিতে বলিল, 'অভিমান কর্ছিস কেন রে অরুণ? জানবার অধিকার তোর অবশ্যই আছে। You are my only friend—'

সাধারণতঃ তাহার কথায় যেমন তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ থাকিত, আজ তাহার কিছুমাত্র আভাস না পাইয়া চিন্তিত হইলাম। বলিলাম, 'তবে বল্, কেন আবার এসব সুরু কর্লি ?'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আগাগোড়া বলব না। কিছুটা বলতে পারি, কিন্তু সত্যি কথা সহ্য কর্ত্তে পার্বি ?'

তাহার কথার ধরণে একটু শঙ্কিত হইলাম। কি যে সে বলিতে চায় যদিও তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না, তবুও কেমন যেন একটা অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় বুকের ভিতরটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

বলিলাম, 'সত্যি কথা সহ্য কর্ত্তে না পারার কি আছে ?'

টেবিলের উপর পা টা তুলিয়া দিয়া মদের গ্লাসটা তুলিয়া লইয়া অনল বলিল, 'ওটা বলা সহজ।'

বলিলাম, 'বল্ শুনি।'

গ্লাসের গায়ে মৃদু মৃদু আঘাত করিতে করিতে বলিল, 'না থাক্। বরং তুই আমার গোটা কতক প্রশ্নের জবাব দে।'

বুঝিলাম সে কথাটা গোপন করিতে চাহিতেছে। এবং ইহাও জানিতাম যে সে যাহা গোপন করিবে তাহা কোন উপায়েই তাহার নিকট হইতে বাহির করা সম্ভব নহে। বলিলাম, 'বল্ কি প্রশ্ন ?'

বলিল, 'তুই আমায় বিশ্বাস করিস্ ?'

বলিলাম, 'কিসের সম্বন্ধে ? বিশ্বাস, মানে— ?'

বাধা দিয়া অনল বলিল, 'মেয়েদের ব্যাপারে। মানে মেয়েদের সম্বন্ধে আমার মনোভাব কি তাত তুই জানিস্ই।'

তাহার প্রশ্নের ধরণটা শুনিয়া অধিকতর চিন্তিত হইলাম।

বলিলাম, 'সামান্য যেটুকু জানি তাতে অবিশ্বাসের কোন কারণ দেখি না।'

আমার জবাবে সে খুশী হইল কিনা জানি না। কিন্তু কোন কথা না বলিয়া নিজের মনেই কি যেন চিন্তা করিতে লাগিল।

সহসা বলিল, 'তুই আমায় কিছুমাত্র বিশ্বাস করিস্ না?'

চমকিত হইয়া বলিলাম, 'তার মানে?'

হাসিতে হাসিতে বলিল, 'রাগ করিস্ না; কথাটা সত্যি।'

ভাবিয়া পাইলাম না যে তাহাকে অবিশ্বাস করিবার মত কি ঘটিয়া থাকিতে পারে—যাহার জন্য আজ হঠাৎ সে এই কথা বলিয়া বসিল।

বলিলাম, 'অবিশ্বাস যে করি তার প্রমাণ আছে?'

বলিল, 'আছে বইকি? না থাকলে কি একথাটা তোকে বলতাম?'

তাহার কথায় উত্তরোত্তর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিলাম।

বলিলাম, 'শুনি কি প্রমাণ আছে?'

গেলাসের অবশিষ্ট অংশ নিঃশেষে পান করিয়া লইয়া অনল বলিল, 'নমিতা যে আমায় ভালবাসত বা বিয়ে কর্তে চেয়েছিল, একথাটা আমায় বলিস্‌নি কেন?'

তাহার কথা শুনিয়া মনে হইল আমার সর্বাঙ্গ দিয়া যেন একটা তড়িৎপ্রবাহ খেলিয়া গেল। বিস্মিত বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। কথা বলিবার সামান্য শক্তিটুকু পর্যন্তও যেন অন্তর্হিত হইল। কারণ সত্যই আমার কিছু বলিবার ছিল না। গভীর লজ্জায় তাহার মুখের পানে নির্ণিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলাম। কিন্তু ভাবিয়া পাইলাম না কথাটা সে জানিল কিরূপে? ভাবিলাম, অনল বুঝি আমার দুর্বলতার সুযোগে কঠিন বিদ্রূপ এবং আঘাত করিবে, এবং করিলে সেই সবের প্রতিবাদেও যে আমার কিছু বলিবার নাই, তাহা উপলব্ধি করিয়া আমার অবস্থা আরও সঙ্কটজনক হইয়া পড়িল। কিন্তু সেসব কিছুই করিল না। উপরন্তু আমার এই অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কিছুটা

সান্ত্বনার সুরে বলিল, 'Take it easy boy. তোর কোন দোষ নেই। এর জন্য দোষ আমারই—It is my sheer bad luck. তুই উপলক্ষ্য মাত্র।'

এতক্ষণে নিজেকে কিছুটা প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়াছি।

বলিলাম, 'তুই কথাটা শুনলি কার কাছে?'

হাসিয়া বলিল, 'সন্দেহ ঘোচেনি তাহলে?'

বলিলাম, 'সন্দেহ নয়—তবে?'

অনল বুক পকেট হইতে দুইখানা চিঠি বাহির করিয়া দিয়া বলিল, 'contentsটা পড়িস্ না—প্রথম এবং শেষ লাইনটা দেখ।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত চিঠি দুইটা তুলিয়া লইয়া তাহার কথামত প্রথম এবং শেষ লাইনটা দেখিলাম। নমিতারই হাতের লেখা; নমিতার নাম সহি রহিয়াছে। চিঠিটা ফেরৎ দিয়া বলিলাম, 'তুই ওর চিঠির কথা আমায় কিছু বলিসনি?'

অনল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না, বলেত কোন লাভ হত না।'

চুপ করিয়া রহিলাম। অনল বলিয়া চলিল, 'কথাটা যখন জানলাম, প্রথমে খুব রাগ হয়েছিল তোর ওপর। তারপর ভেবে দেখলাম তোর কোন দোষ নেই। নিজের সম্বন্ধে যেভাবে যা বলেছি তাই সকলেই বিশ্বাস করেছে—তুইত ছেলেমানুষ। তা'ছাড়া বিচার করে দেখবার মত বুদ্ধি সংসারে কটা মানুষেরই বা থাকে—তুই কিছু মনে করিস্না অরুণ। এ সবই আমার অদৃষ্ট!'

কথাগুলি বলিয়া সে একটু ম্লান হাসিল। তাহার কথার মধ্যে সাধারণতঃ একটা রূঢ় ঔদ্ধত্যের সুর থাকিত। কিন্তু আজ যেন তাহার পরিবর্তে একটু আক্ষেপের আভাস পাইলাম। কিন্তু তবুও তাহার মদ্যপানের কোন কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না।

বলিলাম, 'মদ খাচ্ছিস কেন তাত বল্লি না?'

বলিল, 'না, সে কথা আর জানতে চাস্ না। তবে এখন যেসব কথা বল্লাম সে সব কথার সঙ্গে মদ খাওয়ার কোন সম্পর্ক নেই।'

বলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে উপরের দিকে চাহিয়া রহিল।

বলিলাম, 'আজ তাহলে চলি।'

অনল অস্ফুটে বলিল, 'আচ্ছা।'

দরজা পর্যন্ত আসিয়াছি এমন সময়ে অনল বলিল, 'দেখ্ অরুণ, নমিতাকে কিন্তু এসব কথা নিয়ে কিছু বলিস্ না। বেচারী বড় দুঃখ পাবে। আর তার যদি কখনও—না থাক্—তুই যা—' বলিয়া জোর করিয়া সব কথা শেষ করিয়া দিয়া আমায় চলিয়া যাইতে বলিল।

পরীক্ষার দিন অনলের দেখা না পাইয়া অবাক হইয়া গেলাম। পরীক্ষায় সে ভাল ফল লাভ কখনও করে নাই বটে কিন্তু পরীক্ষা না দিতে কখনও তাহাকে দেখি নাই। অন্যান্য সবকিছুর মত পড়াশোনাটাও তাহার কাছে ছিল খেলার সামগ্রী।

বিকাল বেলায় বাড়ী ফিরিয়া অনলের সংবাদ লইতে গিয়া নির্বাক বিস্ময়ে শুনিলাম অনল নিরুদ্দেশ হইয়াছে। এযাবৎ তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই, যদিও সংবাদ লইবার যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে। খবরটা শুনিবামাত্র মনে হইল তাহার গৃহত্যাগের জন্য অপরাধ যেন আমারও কিছু কম নহে। এবং অত্যন্ত অকারণেই চোখের কোণ দুইটা জ্বালা করিয়া উঠিল। নিঃশব্দে অনলের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিলাম।

ইহার পর আরও চারিটা বছর কাটিয়া গিয়াছে। সেইসব দিনগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা পরীক্ষায় পাশ করিয়া সসম্মানে সরকারী চাকুরীর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছি। পুরাতন বন্ধুবান্ধবদের কথা সচরাচর মনে পড়ে না। কারণ নূতন সঙ্গী জুটিয়াছে বহু। শুধু মাঝে মাঝে অনলের

কথা মনে হইত। কোথায় আছে সে—কেমন আছে? এতদিন তাহার কোন খবরই পাই নাই।

শ্রাবণের এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় আফিস হইতে ফিরিয়া কাপড়জামা ছাড়িয়া বিশ্রাম করিতেছি সহসা চাকর আসিয়া জানাইল একটি বাবু আমার সঙ্গে দেখা করিতে চাহেন। বিরক্ত হইয়া বসিবার ঘরে আসিয়া হাজির হইলাম। দেখি, পাশ্চাত্য পোষাক পরিহিত একজন ভদ্রলোক আমায় আসিতে দেখিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অপ্রসন্ন মুখে বলিলাম, 'কি চাই আপনার?'

ভদ্রলোক বলিলেন, 'আপনার নামই কি অরুণ ব্যানার্জি?'

বলিলাম, 'হ্যাঁ, কি দরকার?'

ভদ্রলোক জানাইলেন যে তিনি একজন ডাক্তার। তাহার বাড়ী পুণায়। জাতিতে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। নামটা কি যেন বলিয়াছিলেন মনে নাই। সব শুনিয়া পুনর্বার তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার উদ্যোগ করিতেই ভদ্রলোক বলিলেন, 'আপনি অনল মুখার্জিকে চেনেন?'

দীর্ঘ চারবৎসর পরে এক অপরিচিত ভদ্রলোকের মুখে অনলের নাম শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, 'বিলক্ষণ চিনি! কি ব্যাপার বলুন ত? কেমন আছে সে? কোথায় আছে?'

সরকারী চাকুরী, পদমর্যাদা ব্যক্তিত্ব সবকিছু ভুলিয়া গিয়া অস্বাভাবিক উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলাম। ভদ্রলোক তাঁহার ওয়াটার প্রুফের ভিতর হইতে একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া বলিলেন, 'তিনি এইটা আপনাকে দিতে বলে গেছেন।'

কম্পিত হস্তে দ্রুত কাগজের মোড়কটি খুলিয়া দেখি, গোটাকতক চিঠি এবং একখানি পাতলা খাতা। মনের মধ্যে তখন শতসহস্র প্রশ্ন উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। সম্ভব অসম্ভব সবরকম চিন্তার ভারে মনটা উত্তরোত্তর ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল।

বলিলাম, 'অনল কোথায় ?'

ভদ্রলোক বলিলেন, 'তিনি মারা গেছেন।'

অব্যক্ত ব্যথায় অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িলাম।

বলিলাম, 'কি হয়েছিল তার ?'

ভদ্রলোক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'তিনি আত্মহত্যা করেছেন। চলন্ত রেলগাড়ীর তলায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন। প্রথম আমিই দেখতে পাই। এই জিনিষগুলি তাঁর পাশেই পড়েছিল। এবং এগুলোর সঙ্গে একটা কাগজ ছিল—তাতে লেখা ছিল যে, জিনিষগুলো পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে না খুলে যেন আপনার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। একটা কাজে কলকাতা এসেছিলাম। তাই দিয়ে যাবার জন্ম এসেছি।'

বলিলাম, 'কবে মারা গেছে ?'

বলিলেন, 'গত পরশু দিন!' আঙ্গুল দিয়া কাগজের মোড়কটা দেখাইয়া ভদ্রলোক বলিলেন, 'একটা বিষয়ে আমায় মাপ কর্তে হবে। ওটা আমি কিন্তু পড়েছি—মানে প্রথমটা আমার সন্দেহ হয়েছিল, হয়ত ওতে অন্য কিছু লেখা থাকতে পারে যার জন্য, ওটা যাতে পুলিশের হাতে না পড়ে তার অনুরোধ করা হয়েছে—তাই ?'

বাধা দিয়া বলিলাম, 'আপনি বাংলা পড়তে জানেন ?'

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ! বাংলা আমি শিখেছি —বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের লেখা বাংলা পড়বার জন্যই শিখেছি', বলিয়া আবার অনলের খাতাখানির উল্লেখ করিয়া বলিলেন, 'অবশ্য সবটা পড়িনি, কিছুটা পড়েই বুঝলাম যে আপত্তিকর কিছুই নেই— নিতান্তই ব্যক্তিগত কথা লেখা আছে—না পড়ে উপায় ছিল না।'

বাধা দিয়া বলিলাম, 'না-না। ওটা আর এমন কি অন্যায় করেছেন? আমি হ'লেও তাই কর্তাম।'

ভদ্রলোক বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

রাত্রি বেলায় নিভৃতে বসিয়া অনলের পাঠান চিঠিপত্রগুলি লইয়া বসিলাম। নমিতার লেখা চিঠি দুইখানির একখানি ছিল। সেখানি পড়িয়া বুঝিলাম নমিতার চিঠির অনল যে জবাব দিয়াছিল তাহারই উত্তরে আবার নমিতা যে চিঠিখানি লিখিয়াছিল, এটি সেইখানিই। নমিতা লিখিয়াছে—

অনল দা, তোমার চিঠি পেলাম। ছোড়দা তোমায় কিছু বলেনি শুনে আশ্চর্য হলাম। সে যাক্। তুমি লিখেছ তোমায় বিবাহ করে সুখী হতে পার্ব না ; কারণ তোমার জীবন সম্বন্ধে তুমি নিজেই এখনও কিছু স্থির করনি! জানি না এ কথাটার অর্থ কি ? বাংলাদেশের মেয়ে হয়ে জন্মে স্বামীর অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পার্ব না, একথাটা বিশ্বাস কর্তে ইচ্ছা হয় না। আরও লিখেছ আমি সুখী হই এই তুমি চাও এবং আমায় তুমি সুখী কর্তে পার্বে কিনা সে বিষয়ে তোমার নিজের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমি কিন্তু সুখী হতে চাইনি অনলদা ; আমি চেয়েছিলাম তোমাকে। হয়ত তোমায় পাবার মত যোগ্যতা আজও অর্জন করে উঠিনি ; এজন্মে আর সে সৌভাগ্য হবে কিনা জানি না। বোধ হয় তা সম্ভব নয়।

তোমার বাকী কথাগুলোও নিঃসংশয়ে মেনে নিতে পার্লাম না। তোমার ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতি যে ইঙ্গিত তুমি করেছ, তা আমি বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয় তুমি কখনও এমন কিছু করনি বা কর্বে না যার জন্যে কাউকে লজ্জিত হতে হবে। বরং এই কথা জোর গলায় বলতে পারি, যে তোমায় অসঙ্কোচে বিশ্বাস কর্তে পার্বে, তোমার দ্বারা তার সামান্যতম ক্ষতি হওয়াও অসম্ভব। বিশ্বাস ভঙ্গ করার মত নীচ তুমি নও।

সে যাক্। চিঠি শেষ করি। লুকিয়ে চিঠি লিখছি—গুছিয়ে লিখতে পার্ছি না। তুমি লিখেছ আমায় তুমি তোমার একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্খিণী

বলে মেনে নিয়েছ! তা যদি সত্যি হয়, তাহলে বিপদের দিনে যদি সত্যিই সাহায্যের প্রয়োজন হয়, দুঃখের দিনে যদি সান্ত্বনার প্রয়োজন হয়, তা হলে আমায় জানিও। মানুষের সঙ্গে পরিচয় আমার সামান্যই, তবে এইটুকু বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে, তোমার মত মানুষের দেখা আর হয়ত পাব না এ জীবনে। নিজেকে অসংযমী বলে প্রচার করেছ। কিন্তু এই কি তার প্রমাণ? আমার সর্ব্বস্ব তোমায় দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তার কিছুমাত্রও গ্রহণ না করে শত গুণ ফেরৎ দিলে আমায়—তোমার এ মূর্তি যারা দেখবে, তারা তোমায় কখনই অসংযমী বলবে না। শুধু তোমারই কথায় আমি সব কিছু নীরবে সহ্য করব। না হলে এ বিয়ের হাত এড়াবার অস্ত্র মেয়ে হয়েও আমি জানি না—তাই কি তুমি মনে কর?

শেষ অনুরোধ আমার। আমার কথা কারুর কাছে প্রকাশ করো না। এমন কি ছোড়দাকেও কিছু বল না। প্রণাম নিও।

তোমারই
নমিতা।

চিঠিটা পড়িয়া চোখ দুইটা জলে ভরিয়া গেল। মনে পড়িয়া গেল—আট বছর আগেকার নমিতার কথা—বধূবেশে সজ্জিতা বালিকা নমিতা। সে যে এমন করিয়া চিঠি লিখিতে পারিত তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। সেই সঙ্গে ভাবিতে লাগিলাম অনলের কথা। সে নমিতাকে কি চিঠি লিখিয়াছিল, জানি না। কিন্তু যাহাই লিখিয়া থাক —সেই চিঠির মধ্যে সাধারণ মানুষের স্বভাবগত লালসার কোন অস্তিত্বই ছিল না, নমিতার চিঠিই তাহার প্রমাণ। অনল নিজেকে অসংযমী বলিয়া অভিহিত করায় নমিতা যাহা লিখিয়াছে তাহার দ্বারা অনলের চরিত্রের দৃঢ়তাই প্রকাশ পায়। নির্বাক বিস্ময়ে কম্পিত হস্তে খাতাটা খুলিলাম। প্রথম পাতায় আমারই উদ্দেশ্যে কয়েকটা কথা

লেখা আছে। অনেকদিন হইতেই সে লেখা সুরু করিয়াছিল তাহা তারিখ দেখিয়াই বুঝিলাম। অথচ সে যে লিখিত তাহা ঘুণাক্ষরেও আমায় জানায় নাই। খাতাটা তাহার জীবনীর ধরণে লেখা। ঠিক ডাইরী নয়। আগাগোড়া প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন নাই। তাই শুধু প্রাসঙ্গিক অংশটুকুই উল্লেখ করিলাম।

লিখিয়াছে—'লোকে বলে অনলের শিখা থাকা অপরিহার্য। শিখার দেখা পেলাম। হয়ত লোকচক্ষে সে শিখা অনলের শোভা কিছু বর্দ্ধন কর্বে না। তবুও—। জীবনে অনেক মেয়ে দেখেছি, বহু মেয়ের সঙ্গে মিশেছি, ঘনিষ্ঠতা করেছি, সম্ভোগ করেছি বহু নারীদেহ; কিন্তু তারা নেহাৎ-ই মেয়ে। চামড়ায় ঢাকা একতাল সচল মাংসপিণ্ড মাত্র। হৃদযন্ত্র কাজ করে বটে, কিন্তু সে শুধু কর্ত্তব্যপালন—মনের বালাই নেই। তাদের হাবভাব, আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ শুধু যে তাদের মনের রিক্ততা ঢেকে রাখতে পারে না তাই নয়—মনে হয়, মানুষের শরীরের ক্ষতস্থান যেমন মাছিদের আকর্ষণ করে, এই মেয়েরা পোষাক পরিচ্ছদের আড়ম্বরে, কথাবার্তা চালচলনে পুরুষকে প্রতিমুহূর্তে শুধু প্রলুব্ধই কর্তে চায়। তাদের সংযত কথাবার্তা অশ্লীলতারই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত মাত্র। সাময়িক আনন্দকে ওরা সুখ বলে মনে করে, তাই দেহের ক্ষুধা ওদের এত বেশী। ওরা কথা বলে না, শব্দ করে মাত্র—সেও অতিমাত্রায় অশ্লীল।...আমি যাকে এতদিন ধরে খুঁজেছি, মনে হচ্ছে এবার যেন তাকেই পেয়েছি। রূপের বালাই নেই তার। যৌবন? তা আছে বই কি; বয়স বেশী নয় ত। সে তার শরীরের কোন অংশে অশ্লীলতার বিজ্ঞাপন এঁটে বেড়ায় না। দীপ্তি নেই বা থাকল, কিন্তু উত্তাপ আছে। নামটাও তার যোগ্য। শিখারাণী।'...

মনে পড়িল শিখার কথা।

'…শিখার সঙ্গে দেখা হল। কথাবার্তার মধ্যে মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। অবাক হ'য়ে ভাবলাম তাকে ভাল লাগল কেন? সৌন্দর্য্য নয় নিশ্চয়ই, কারণ অক্লেশেই কুৎসিত বলা চলে তাকে। বিবাহের বাজারে মূল্যহীনা উচ্চশিক্ষিতা মেয়েদের স্বজাতি সে। কালচার? তাও নয়। তার চেয়ে কালচারড্ মেয়েও দেখিছি। সত্যি ওসব কিছু নয়। ভাল লাগল তার দুটি জিনিষ—একটি তার মন, অপরটি তার চোখের দৃষ্টি। অন্য সব মেয়েগুলোর চোখ যেন জ্বলে; মুখে কথা বলার আগেই তাদের চোখই যেন বলে দেয় সব কিছু। আর শিখা? কথা বলে কম। বলার কথা যেন ফুরিয়ে গেছে—সব কথা বলার পরও চোখের দৃষ্টি তেমনি শান্ত, তেমনি স্তিমিত, তেমনি ম্লান। গরীবের ঘরের মেয়ে—পদবী বোস্। বিবাহ? সেটা সম্ভব নয়। সামাজিক বিধি-নিষেধ! আঃ! এ সমাজ ভেঙ্গে পড়বে কবে? মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় হল—কবিগুরুর 'কৃষ্ণকলি' কবিতাটা মনে পড়ছে —'কালো তারে বলে বলুক লোক, মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ?' কি গভীর কালো তার চোখ! আমার ভবিষ্যৎ জীবনটাকে এক মুহূর্ত্তে দ্বিগুণ কালো করে দিল তার চোখের দৃষ্টি! আশ্চর্য বটে—অনল চাইছে শিখাকে। সর্বান্তকরণে চাইছে। যে অনলের কাছে মেয়েদের মূল্য এক পয়সার মাটির পুতুলের চেয়ে এক কড়িও বেশী নয়।'…

খাতাটির লেখাগুলি নেহাৎই খাপছাড়া; তবে হঠাৎ পড়িলে মন্দ লাগে না।

'শিখার সঙ্গে কথা বলছিলাম। আমার সম্বন্ধে সব শুনেছে। আমার কলুষিত চরিত্রের কথা—উচ্ছৃঙ্খলতার কথা—সব। বলে, 'অন্যায় কি? যদি বুঝে থাকেন যা করেছেন তা ঠিক, যদি নিজের অন্তরের সমর্থন পেয়ে থাকেন সব কিছুতে—তাহলে অন্যে কি বল্ল না বল্ল, তাতে

কি আসে যায় ? আর তা শুনবেনই বা কেন ? যে কাজের জন্ম অনুশোচনা কর্তে হয়, অন্যায় তাকেই বলে।' কথাটা নূতন শুনলাম। বল্লাম, 'চিরদিনই মনে করে এসেছি, মেয়েরা আমার খেলার সামগ্রী—' বাধা দিয়ে বল্ল, 'সে মেয়েরাও হয়ত পতঙ্গের মত চঞ্চল ছিল। অনল মাত্রেই পতঙ্গকে আকর্ষণ করে, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ?' আমি কিন্তু আশ্চর্য হলাম তার কথা শুনে, ভাবলাম বলি, অনল পতঙ্গকে আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু অনলের সঙ্গে শিখার যোগাযোগও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সাহস হল না। I like to please her and not to tease. দৌর্বল্য ? হবে হয়ত। But it is a healthy weakness, not a chronic one—and I like it. তার কি দেখে যে আকৃষ্ট হলাম, জানি না। বাস্তবের হাটে তাকে দেখলে লোকে বলবে, আমি ঠকেছি ; কিন্তু আমি জানি আমি ঠকিনি !'...

ভাবিলাম, কি জানি রূপহীনা শিখার মধ্যে অনল কিসের সন্ধান পাইয়াছিল। তবে কিছু একটা নিশ্চয়ই দেখিয়াছিল সে, নচেৎ মরীচিকার পিছনে অন্ধের মত ছুটিয়া বেড়াইবার পাত্র নয় অনল।

...'আজ তার সঙ্গে আলোচনা হল। বিষয়বস্তু বিবাহ ! সে বলে 'জীবনধারণের অপরিহার্য অঙ্গ বিবাহ। সংসারে বাঁচতে গেলে প্রত্যেক মানুষকে নির্দ্দিষ্ট দায়িত্ব বহন করে প্রমাণ কর্তে হয় যে, সে তার উপযুক্ত। যেমন—রেলষ্টেশনের মাল ওজন করা আর কি !'—বল্লাম, 'যাদের সে দায়িত্বজ্ঞান নেই, তারা কি কর্বে ?' বল্ল, 'দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষের স্থান এ পৃথিবীতে নেই। আমাদের প্রত্যেকের একটা না একটা দায়িত্ব আছে ; সে দায়িত্ব গ্রহণের অক্ষমতাকে যারা অপরের কাঁধের উপর দিয়ে চালাতে চায়, আমি তাদের দলে নই।' বল্লাম, 'আমি শুধু চাই

দারিদ্র্যের হাত এড়াতে ?' হেসে বল্ল, 'নিজের অক্ষমতার জন্য অপরকে দোষী কর্বেন না অনলবাবু—।'

'ঘনিষ্ঠতা কর্তে চায় না। কেন? অবিশ্বাস? আমায়? কিন্তু শপথ করে বলছি, তার দেহটা আমার কাম্য নয়। আমি চাই তার সাহচর্য।...সেদিন প্রশ্ন কর্লাম, বিবাহ সম্বন্ধে তার অভিমত কি? হেসে জবাব দিল, 'Marriage is a relation in which, one must surrender at the hand of the other one.' তার কথা শুনে আশান্বিত হলাম। বল্লাম, 'What do you think of love?' হেসে বল্ল, 'It's a fair game if nicely played ; the object, rather the goal, is marraige.' হেসে বল্লাম, 'আপনার কথাগুলো উলটো পালটা বলে মনে হচ্ছে না?' মাথা নেড়ে সে বল্ল, 'না। জীবন-দর্শনের প্রথম কথা হচ্ছে, একপক্ষের ক্ষতিতে হবে অন্যপক্ষের লাভ।'

শিখার সম্বন্ধে অনলের যে দৌর্বল্য জন্মিয়াছিল সেই কথা আমরা কেহই জানিতাম না। কারণ কথাটা একবারও আমাদের মনেই হয় নাই। যাহারা অনলের অসংযত জীবনের ইতিহাস জানিত, তাহারা অনলের রূপলুব্ধতাটুকুই একমাত্র সত্য বলিয়া নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিত। ইহা ছাড়া যে অনলের আরও একটি দিক ছিল, তাহা কেহই জানিত না। আমি নিজেও অনলের উচ্ছৃঙ্খল জীবনটুকুর ইতিহাস ছাড়া অন্য কিছু দেখি নাই, তবুও তাহার উচ্ছৃঙ্খলতাটুকুকেই একান্ত সত্য বলিয়া কখনও গ্রহণ করি নাই। এবং তাহার পরিচিত বহু নারীর মধ্যে সহসা শিখা যে তাহাকে এমনিভাবে আকৃষ্ট করিবে এই সম্ভাবনাটাও কখনও আমার মনে উদিত হয় নাই।

কয়েক পৃষ্ঠা উল্টাইবার পর আরেক জায়গায় অনল লিখিয়াছে, 'আমার নামের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলাম; অনল চিরদিনই পতঙ্গকে আকর্ষণ করে; কিন্তু অনল ও যে আকৃষ্ট হয় আজ তা বুঝতে পার্ছি। কিন্তু

প্রকাশ কর্তে পারি না। মনে হয়, কেউ আমায় বিশ্বাস কর্বে না। পরিহাসচ্ছলে জীবনের বহুক্ষেত্রে যে অসংযমের পরিচয় দিয়েছি, তা যারা দেখেছে, তারা আমার আজকের কথা অসঙ্কোচে হেসে উড়িয়ে দেবে। একমাত্র বলা চলে অরুণকে। কিন্তু সেখানেও ভয়। নমিতার কথা সে আমায় বলতে এসেও বলেনি। অর্থাৎ সেও আমায় বিশ্বাস করে না। অপরাধ তার নয়—অপরাধ আমার নিজেরই। শিখাও বোধ হয় বিশ্বাস করে না; আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সময়ে সময়ে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। অথচ—না থাক সে কথা।'

'তার চোখের দৃষ্টি আমার মনের সব চিন্তাধারাকে এক মুহূর্ত্তে ওলটপালট করে দেয়—তার প্রতি একটা অস্বাভাবিক মমতা এসে যাচ্ছে। মেয়েদের সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করার না ছিল অবসর, না ছিল ইচ্ছা। খেলার ছলে তাদের নিয়ে চরমতম পরিহাস করেছি—তারাও তাই চেয়েছিল। কোনদিন ভেবে দেখিনি এ জীবন ভালো কি মন্দ। কোনদিন যে এর ব্যতিক্রম হতে পারে তাও ভাবিনি। কিন্তু শিখার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে কেবলই মনে হচ্ছে, সংযমেরও যেন একটা প্রয়োজন আছে। কেন এই অদ্ভুত চিন্তা? দৌর্বল্য? কিসের? দেহ নিয়ে মাথা ঘামানর মন আর নেই। বহু নারীই স্বেচ্ছায় উজাড় করে দিয়েছে তার সকল সম্পদ—কিন্তু শিখাকে দেখলে মনে হয়—সে যেন বহুদূরের নক্ষত্র। আলোটুকু পৃথিবীতে এসে পৌছায় না। শুধু তার দীপ্তিটুকু মনকে মোহাবিষ্ট করে। নিজেরই আশ্চর্য বলে মনে হচ্ছে। যে অনল নারীর সম্বন্ধে ওষ্ঠ বিকৃত করে বিদ্রূপ করেছে চিরদিন—আজ সেই অনল যাঁর সম্বন্ধে সসম্ভ্রমে কথা বলছে—সে ও নারী। নিজের জীবন সম্বন্ধে নিজেরই সন্দেহ আছে প্রচুর। তাই সেই সন্দিগ্ধ জীবনের দুঃসহ গ্লানির হাত থেকে নমিতাকে রক্ষা করেছি। কতদিন বাঁচব জানি না। তবে বেশীদিন নয় নিশ্চয়ই।

কিন্তু তার আগে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও কি জানতে পার্ব না শিখা কি চায়?

... ... নমিতা বিধবা হয়েছে। খবরটা শুনে মনে হল দুই হাত দিয়ে নিজের হৃৎপিণ্ডটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বলি, মিথ্যা, মিথ্যা সব মিথ্যা! ভগবানে বিশ্বাস করি না; তবুও কেঁদেছি আর বলেছি, এ তুমি কি কর্লে? এমনি করে একটা সুন্দর জীবনকে এমন ভাবে অকালে ব্যর্থ করে দিলে কেন? তোমার সৃষ্টির কি সার্থকতা আছে এই নিষ্ঠুরতার মধ্যে? নমিতা? সেইদিনের সেই ছোট্ট মেয়েটা—তার লেখা চিঠি দুটো পড়ছিলাম—মনে হতে লাগল আমার দ্বারা কোন ভাল কাজই সম্ভব নয়। মানুষ কি অহংকারী? কি নির্বোধ? ভেবেছিলাম নমিতাকে সুখী কর্ব? তাই নিজেকে তার সামনে থেকে সরিয়ে এনেছিলাম। কিন্তু পার্লাম কি?'

'... জীবনের সম্বন্ধে সংশয় জাগছে। মনে হচ্ছে এবার সব ভেসে যাবে—সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—পায়ের তলার মাটিটুকুকেও যেন বিশ্বাস কর্তে পার্ছি না। মাঝে মাঝে নিজেকে বলছি, 'অধৈর্য হোয়ো না।' কিন্তু পরক্ষণেই অনুভব করি, আমি ত অধৈর্য হইনি। বরং, পরম ধৈর্যের সঙ্গে নিজের জীবনের শেষদিনটির প্রতীক্ষা কর্ছি। আত্মহত্যা কর্তেই হবে—কিন্তু সে সময় কি এখনও আসেনি?'

'...শিখার কাছে নির্লজ্জের মত বল্লাম, আমায় মানুষ করে তোলার ভার নিন।' এ দৌর্বল্য কোথা থেকে এল? ঠিক যা ভেবেছিলাম তাই। বল্ল, 'সংসারে কে কাকে মানুষ করে অনলবাবু? আপনি স্বেচ্ছায় জীবনের দুর্গমতম পথ বেছে নিয়েছেন—নিজের জীবনটাকে নিয়ে পরিহাস করেছেন—প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন—আশে পাশের মানুষদের বিদ্রূপ করেছেন—আজ আপনি হঠাৎ সে পথ থেকে ফির্তে চাইলে, আপনার মনই বাধা দেবে।' আর সহ্য কর্তে

পার্লাম না। তার ডান হাতখানা ধরে বলে উঠলাম, 'Please let me marry you'. আশ্চর্য এই নারী জাতটা। আমায় তার একান্ত কাছে টেনে নিয়ে বল্লে, 'অধৈর্য হওয়াটা বলিষ্ঠতার লক্ষণ নয়। এত অল্পে ভেঙ্গে পড়েন কেন? আমায় বিবাহ করে আপনি কি সুখী হবেন ভেবেছেন? ভুল। আমার মধ্যে কিছুই নেই। যার জন্যে আপনার চোখে আমি অপরূপ হয়ে উঠেছি—সেটা আপনারই নিজের মনের সম্পদ। পারেন ত এ সম্পদটুকু নষ্ট করে ফেলবেন না। বিবাহের প্রয়োজন এখনও আপনার জীবনে আসেনি। যদি কোনদিন আপনার জীবনের সব উচ্ছ্বাস থেমে যায়, তা হলে সেইদিনই আপনি বিবাহ কর্তে পারেন। ততদিন আপনাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে। আর'…একটা কি কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল। কি বলতে চেয়েছিল সে?'

'শিখার বাবা মারা গেলেন। পরিবারের অবস্থা কি হবে তাই ভাবছি। নতুন কিছু নয়। বাংলা দেশে এমনি দুর্দ্দশা প্রতিমুহূর্ত্তেই বহু মানুষের জীবনে ঘটছে। শিখা চলে যাচ্ছে বোম্বেতে—তার মামার কাছে। সেখানেই M. A. পড়বে। বল্লাম, 'কবে দেখা হবে?'—উত্তর এল, 'দেখা করার প্রয়োজন আছে কি বিশেষ?' ম্লান হেসে বল্লাম, 'ঠাট্টা কর্ছেন? আপনি কি জানেন না'…বাধা দিয়ে বল্ল, 'সব জানি। কিন্তু আপনার কি মনে নেই, বেলা দত্তের বাড়ীতে বসে দীপ্তিকে কি বলেছিলেন? মেয়েদের কাছে আপনার কিছুই চাইবার নেই।' মনে পড়ে গেল বলেছিলাম বটে; শিখাও সেখানে ছিল। বল্লাম, 'সেই কথাটাই মনে রেখেছেন শুধু?' বল্ল, 'মনে আমি কিছুই রাখি না। তবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেগুলো মনের মধ্যে বাসা বাঁধে সেগুলো তাড়াই কি করে বলুন?' বিস্মিত হয়ে ভাবলাম, কি বলতে চায় সে? বল্লাম, 'সেদিনের কথাটাই মনে রাখলেন আর সব ভুলে গেলেন?' বল্ল,

'তার জন্য অপরাধ আমার স্মৃতিশক্তির।' বেশ বুঝতে পার্লাম সে আমায় এড়িয়ে যেতে চায়। আবার বল্লাম, 'যাবার আগে একটা কথা আপনাকে জানান প্রয়োজন বলে মনে করি। সে কথাটা নিয়ে বিদ্রূপও কর্তে পারেন আমায়। আপনাকে আমার ভাল লেগেছে।' সস্মিত মুখে সে বল্ল, 'সেটা কি আজ আমায় আপনার মুখ থেকে শুনে বুঝতে হবে? মেয়েমানুষ হয়েও সে কথাটা কি এতদিনে বুঝতে পারিনি ভাবেন?' বল্লাম, 'কি জানি, হয়ত ভেবেছিলাম যে আপনি বোঝেন নি বা বুঝতে ভুল করেছেন।' শিখা বলল, 'ভুল আমি করিনি। কিন্তু প্রশ্ন করি, এতে কি লাভ?' আকুল হয়ে বল্লাম, 'আপনি কি আমায় বিবাহ কর্তে পারেন না?' মাথা নেড়ে বল্ল, 'না।' প্রশ্ন কর্লাম, 'কেন? আমার চরিত্রের—।' বাধা দিয়ে বল্ল, 'না। মানুষের জীবনে চরিত্রের কোন মূল্য নেই। আর আমি sex এর সঙ্গে character এর গোলমাল কখনও করিনি? অন্য কারণ আছে।' প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ভাবলাম চরিত্রের কলুষতাকে যে গ্রাহ্য করে না, সংসারে তার আর কি থাকতে পারে যাকে সে অস্বীকার কর্তে অক্ষম? বল্লাম, 'আর কারণটা কি শুনি?' বল্ল, 'সামাজিক নিষেধ! আপনি ব্রাহ্মণ আমি কায়স্থ।' অবাক হয়ে গেলাম। বল্লাম, 'এই পার্থক্য কে আপনি স্বীকার করেন এখনও?' সপ্রতিভ ভাবে শিখা উত্তর দিল 'করি।' অধৈর্য হয়ে বল্লাম, 'আপনার নিজের কি মত?' বল্ল, 'আমার নিজের মতটা সংসারে তুচ্ছ; কারণ আমি যাদের মধ্যে বেঁচে আছি, তাদের মতের মূল্য আমার মতের অপেক্ষা অনেক বেশী। সংসারে আমার মা আছেন, ছোট ভাইবোন আছে, সকলের কথাই আমায় ভেবে দেখতে হয়।' মনে হল আমার সমস্ত অন্তরটা যেন অতি নিষ্ঠুরের মত সে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। বল্লাম, 'এতটা দুর্বল আপনাকে ভাবতে পারিনি?' সে বল্ল, 'ভুল করেছেন। আমি এমন কিছু শক্তির

পরিচয় দিইনি যারজন্য আমায় আপনি অসাধারণ বলে ধরে নিতে পারেন?' মনে হল সত্যিই ত। এতদিনের পরিচয়ের মধ্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ আমি একাই করেছি। সে যেরকম নীরব, সেই রকম নীরবই রয়ে গেছে। বল্লাম, 'তাহলে যাবার আগে একবার নিজমুখে বলে যান, আপনি আমায় নিয়ে শুধু খেলা করেছেন।' হেসে শিখা বল্ল, 'উত্তেজিত হয়ে যুক্তি হারিয়ে ফেলবেন না অনলবাবু; এটা আপনার পক্ষে অশোভন। ভেবে দেখুনত, আপনাকে নিয়ে সত্যিই কি খেলা করেছি? আপনি আমার কাছে যেভাবে এসেছিলেন, আমি আপনাকে সেই ভাবেই নিয়েছি—উচ্ছ্বসিত হওয়া অমার স্বভাববিরুদ্ধ।' মনের মধ্যে কি যেন হয়ে গেল, দুঃস্বপ্ন ভেঙ্গে জেগে উঠলে মানুষের যেমন অবস্থা হয়, আমার ও তাই হল। চলে এলাম সেখান থেকে। ...মদ খাচ্ছি প্রচুর। কেন? আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে আসছে।'

'বম্বে পৌছলাম। শিখার ঠিকানা জানি। দেখা কর্ব কিনা ভাবছি। হয়ত বিবাহ হয়ে গেছে। নিজের মনের ক্ষতস্থানটাকে জ্বালিয়ে তুলে লাভ কি? বেশ ত আছি! কিছুতেই নিজের মনটাকে স্থির কর্তে পার্ছি না—কেবলই মনে হচ্ছে এপথ যেন আমার জন্য নয়। মানুষ আমায় যতটা নীচ ভাবে আমি ততটা নীচ নই। কিন্তু প্রমাণ দেবে কে? আর বিশ্বাসই বা কর্বে কে?'

ইহার পর অনল বহু জায়গায় ঘুরিয়াছে। প্রায় ভারতের সর্বত্রই গিয়াছিল। আত্মহত্যা করিবার পূর্বে আবার সে সহসা বম্বে গিয়া উপস্থিত হইয়া অযাচিতের মত শিখার সহিত দেখা করিয়াছিল। কয়েকদিন আগের তারিখ দিয়া লিখিয়াছে। 'ঠিকানা খুঁজে খুঁজে শিখার বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম। শিখা খবর পেয়ে নেমে এল। মুখে চোখে ফুটে উঠেছে অসীম খুসীর আভাস। বল্ল, 'আপনি হঠাৎ?' ইচ্ছা হল বলি, যে গত চারবছর শুধু তোমারই দেখা পাবার জন্য

ভিখারীর মত ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু বল্লাম, 'এলাম কোন কাজ নেই।' লক্ষ্য করে আশ্বস্ত হলাম, শিখার বিবাহ হয়নি এখনও। সে বল্ল, 'কি কর্ছেন এখন?' বল্লাম, 'কিছু না—স্রেফ্ ঘুরে বেড়াচ্ছি।' শিখার মুখটা একটু অপ্রসন্ন হয়ে উঠল; তবুও সে ভাবটা গোপন করে সে বল্ল, 'বিয়ে করে এবার সংসারী হয়ে পড়ুন।' রহস্য করে বল্লাম, 'বিয়ে কর্ব বলেই ত এসেছি।' রহস্যটা বুঝতে না পেরে বল্ল, 'কোথায় বিয়ে হবে?' বল্লাম, 'সে খবর আপনিই ত দেবেন।' বিস্মিত হয়ে বল্ল, 'তার মানে?' বল্লাম, 'আপনি যেদিন চলে আসেন তার আগের দিনগুলির কথা মনে পড়ে?' সভয়ে শিখা বলে উঠল, 'চুপ করুন, মা শুনতে পাবেন।' বল্লাম, 'শুনলেনই বা। অনেক সহ্য করেছি সংসারে—কিন্তু আর নয়। হয় আমি তোমায় পাব—' ব্যাকুল হয়ে শিখা বলে উঠল, 'আপনার পায়ে পড়ি অনলবাবু—ঘরে আসুন। সব বলছি।' ঘরে গিয়ে বসলাম। বল্ল, 'দাঁড়ান আসছি।' বলে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এল, সঙ্গে একটা ছোট্ট ছেলে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটি কে?' হেসে বল্ল, 'আমার ছেলে।' স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম শিখার মুখের পানে। বল্লাম, 'তোমার ছেলে?' বল্ল, 'হ্যাঁ। অবাক হবার কিছু নেই। এখানে আসার পরই বিয়ে হয়েছিল। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মামা বিয়ে দিলেন। বাংলা দেশের মেয়ে ত। কোন উপায়ই ছিল না। ভেবেছিলাম—' কথাটা বলে শিখা চুপ করে গেল। বল্লাম, 'কি ভেবেছিলে?' চকিত হয়ে বল্ল, 'নাঃ কিছু না। বিয়ে হবার দুবছরের মধ্যেই স্বামী মারা গেলেন।' পায়ের তলায় মাটিটা দুলে উঠল। বিবর্ণ মুখে বল্লাম, 'এত আমি জানতাম না শিখা। জানলে কখনই আসতাম না। আচ্ছা চলি—' উঠে পড়লাম। সে বল্ল, 'তাকি হয়? কতদিন পর দেখা হল, কিছু খেয়ে যান।' বল্লাম, 'সৌজন্য, রক্ষা আর নাই বা কর্লে শিখা।' ম্লান মুখে শিখা বল্ল, 'সৌজন্য নয়। আবার

দেখা হবে কিনা কে জানে?' বল্লাম, 'তারমানে?' বল্ল, জর্নালিজম পড়তে আমেরিকা যাচ্ছি,—কবে ফির্ব জানি না। আদৌ ফির্ব কিনা তাই বা কে জানে?' বল্লাম, 'ফির্তে তোমায় হবেই—' আস্‌বার সময় শিখার ছেলেটাকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলাম। শিখার ছেলে! বাড়ীর বাইরে তখন কর্মব্যস্ত বম্বে সহরের রাস্তায় মানুষের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। সকলেই ব্যস্ত। কারুর সময় নেই পিছনে ফিরে তাকাবার —কোথায় চলেছে সব মানুষগুলো? মনে হল নমিতা বিধবা, শিখা বিধবা, অথচ আমি এখনও বেঁচে আছি। কেন? কি প্রয়োজন আমার বাঁচার? কি সার্থকতা আমার বেঁচে থাকার? সমস্ত জীবন ধরে শুধু অন্যায় করে গেলাম, যে অন্যায় সমর্থন করার মত কোন যুক্তি নেই আমার। জীবনধারণের স্বপক্ষেও যে যুক্তি হারিয়ে ফেলছি।

রাস্তায় বেরিয়ে আসার পর শিখার ছোটভাই আমার হাতে একটা চিঠি দিল; বল্ল, 'দিদি দিয়েছে।' চিঠিটা অন্যমনস্কের মত বুক পকেটে রেখে দিলাম। পড়বার মত ইচ্ছা আর ছিল না। সেই দিনই সন্ধ্যা-বেলায় বোম্বে থেকে চলে আসব বলে ট্রেণে উঠলাম। কোথায় যাব ঠিক নেই। কেবলই মনে হচ্ছে কাণের কাছে কে যেন বলছে, 'পালিয়ে যাও, মানুষের কাছ থেকে পালিয়ে যাও।' কোন দিকে যাচ্ছি জানি না। কটা ষ্টেশন যেন পেরিয়ে গেল। হঠাৎ বুক পকেটের চিঠিটার কথা মনে হল। শিখার দ্রুত হাতের লেখা, 'অনল, তোমায় বঞ্চনা করিনি কখনও—ভাল তোমায় আমি বেসেছিলাম। আজও বাসি। কিন্তু সেদিন যে কারণে তোমায় বিবাহ কর্তে রাজী হইনি, আজও সে কারণ বর্ত্তমান। তাই সবচেয়ে দুঃখ আমার আজ, তোমায় শূন্য হাতে আমার কাছ থেকে ফিরে যেতে হল। ভবিষ্যতে তুমি আবার যদি এসে দাঁড়াও আর হয়ত নিজেকে সামলাতে পার্ব না। আর তুমি আমার কাছে এস না কখনও। আমায় তুমি ক্ষমা কর। —তোমারই শিখা।'

মনে মনে বল্লাম আবার যাতে কখনও তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে না হয় তার চেষ্টাই কর্ছি। তোমার অনুরোধ রাখব। কি একটা ষ্টেশনে যেন গাড়ীটা থেমেছে—নেমে পড়লাম। কোন ষ্টেশন কে জানে? কোথায় যাব? সামনে গভীর অন্ধকার; চাঁদ উঠেনি এখনও, বেরিয়ে পড়লাম ষ্টেশন থেকে। অনেকক্ষণ জনহীন পথে পথে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়ালাম। হঠাৎ মনে হল এ কি কর্ছি? লোকালয় থেকে দূরে যেতে চাই, কিন্তু এ কোথায় আসছি! পরক্ষণেই মনে হল কোথায় কত দূরেই বা যাব? যেখানেই যাব সেইখানেই মানুষের ভীড়। জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যায়—তার চেয়েও? একটা ফন্দী মাথায় এল। নিষ্ঠুর আনন্দে মনটা নেচে উঠল। আনন্দের আতিশয্যে পথ ভুল কর্লাম। আর কতদূর? ঐ ত রেল লাইন। ষ্টেশনটা কোনদিকে? মনে হল চকচকে রেল লাইনটা যেন আমার বিগত জীবনের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে—ওর ওপাশে আছে আমার নতুন জীবন! নূতন স্বপ্ন! নূতন আশা! হয়ত ওই রেললাইনটা পেরিয়ে যেতে পার্লে নূতন করে বাঁচব! কিছুক্ষণের জন্ত দাঁড়িয়ে গেলাম। ভাবলাম কি লাভ? বেঁচে থেকে কি লাভ? বহুদিন পৃথিবীতে এসেছি, কিন্তু কিছু লাভ হয়েছে কি?—যাযাবর জীবনের উৎকট মোহ আমায় তাড়া করে ফিরেছে—স্থির হতে দেয়নি। কোন লাভ হয়েছে কি? সমস্ত জীবন ধরে কত হীনতা স্বীকার করে অপরিচিতের মত বেঁচে রইলাম—কিন্তু কি লাভ হল? চোখের সামনে নমিতাকে দেখলাম বিধবা হতে—শিখা বিধবা হল! অসহায়ের মত চোখ চেয়ে দেখলাম। নিষ্ফল আক্রোশে গুমরে মর্ছে অন্তরাত্মা; কিন্তু উপায় নেই! আমার কোন প্রয়োজন নেই···।

···ট্রেন আসছে। আলো দেখা যাচ্ছে; রেল লাইনটা চকচক করে উঠ্‌ছে···রেললাইনের ওপারের জীবনে যে সত্যের দেখা পাব কিছু

নিশ্চয়তা আছে কি? শুধু প্রলোভন? —ট্রেনটা আরও কাছে এসে পড়ছে—। একটা কিছু স্থির করে ফেল, আর সময় নেই—**hurry up.** যাবে অনল লাইনের ওপারে? পারবে পেরিয়ে যেতে? শিখার শেষ অনুরোধ আর কখনও সামনে যাব না! জীবনের সর্বত্রই সংশয়! তার চেয়ে সব সংশয় থেকে চিরদিনের জন্য মুক্ত হই।...'

সশব্দে যাত্রীবাহী ট্রেনখানা চলিয়া গেল। মধ্যরাত্রির আলস্য জড়িত নিদ্রামগ্ন যাত্রীরা পরম আনন্দে ঘুমাইতেছে—ড্রাইভার কি দেখিল কে জানে? —মসৃণ চাকা ও লাইনের মধ্যে সামান্যতম প্রতিবন্ধকের কথা কেহই জানিতে পারিল না।...অনলের খণ্ডবিখণ্ড রক্তাক্ত দেহটা পড়িয়া রহিল। মানস চক্ষে সেই বীভৎস দৃশ্য দেখিতে পাইয়া শিহরিয়া উঠিলাম। সেই হতভাগাটাকে ভালবাসিয়াছিলাম সত্যই। কিন্তু তাহাকে যে এমনি করিয়া ভালবাসিয়াছিলাম তাহা ভাবিতে পারি নাই। তাহার সহিত প্রথম পরিচয় হইতে সুরু করিয়া একে একে সবগুলি ঘটনাই সিনেমার ছবির মত চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। মনে হইল তাহার এই শোচনীয় পরিণতির জন্য দায়ী কে? পরবর্তী জীবনে যখনই তাহার কথা গল্পচ্ছলে কাহাকেও বলিয়াছি, সে হয়ত বলিয়াছে আদর্শের অভাব; অথবা **Inferiority complex** অথবা অন্য কোন গূঢ়তত্ত্বের আভাষ দিয়া অনলের জীবনের শোচনীয় ব্যর্থতার দুঃসহ বেদনার ট্যাজিডিটা লঘু করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সেদিন বর্ষণমুখর রাত্রে তাহার স্বরচিত ইতিহাস এবং অন্যান্য চিঠিপত্রগুলি পড়িয়া হঠাৎ যেন মনে হইল অপরাধ আমাদেরই বেশী। আমরা শুধু যে তাহাকে বুঝিতে পারি নাই তাহা নহে; উপরন্তু গায়ের জোরে তাহাকে ভুল বুঝিয়াছি। তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার মত শক্তি বা সাহস আমাদের কাহারও ছিল না। তাই সে চেষ্টাও কেহ করি নাই। শুধু তাহাই নহে, তাহাকে ভুল বুঝিবার অপরাধের

প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে দিয়াই করাইয়াছি। কালীধন ঠিকই বলিয়াছিল যে অনল তাহার মনোমত জীবনের পরিবেশ খুঁজিয়া পায় নাই। তাহার অসংযত জীবনের বাহ্য আচরণটুকু উন্মোচন করিয়া তাহার মনের গোপন সত্যটুকু জানিবার কোন প্রচেষ্টাই কেহ করে নাই কখনও। তাই জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত সে সকলের কাছেই অনাহূত রহিয়া গেল। একটি মাত্র ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া শত শত মানুষের মধ্যে অবলীলাক্রমে বাঁচিয়া গেল। সেই ছদ্মবেশ অসহ্য হইয়া উঠিলে যখন আমাদের কাছে সে তাহার মনের গোপন বেদনাটুকু জানাইবার জন্য আসিয়াছে, তখন নিতান্ত নির্ব্বোধের মত আমরা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। জানি না, এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয় কি করিলে? কিন্তু সেই সর্ব্ববাদিসম্মত লক্ষ্মীছাড়াটার কাহিনী ও শোচনীয় পরিণতির কথা স্মরণ করিয়া আজ অত্যন্ত অকারণেই চোখে জল আসিয়া গেল। অস্ফুটে তাহার স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশ্যে বলিলাম, 'জানি না তোমার মৃত্যুর সংবাদ কেহ জানে কি না, অথবা তোমার মৃত্যুসংবাদে কাহারও চোখে জল পড়িবে কি না? তবে তোমায় সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসিয়াও যে তোমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি নাই, এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য সারাজীবন চোখের জল ফেলিতে হইবে আমায়। কারণ তোমার প্রতি আমার মত কেহ অবিচার করে নাই। শিখাকে যদি ক্ষমা করিয়া থাকিতে পার তাহা হইলে আমায়ও ক্ষমা করিও—ইহাই আমার শেষ অনুরোধ।'

সমাপ্ত

—অন্যান্য বই—

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পালের

দুর্গম গিরিশিরে—৩৲

শ্রীআদিত্যশঙ্করের

পরবাসী—৩৲

শ্রীঅজয় রায়ের

হে ক্ষণিকের অতিথি—২॥০

শ্রীমৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়ের

এ যুগেও কতো প্রেম—১॥০

(মোঁপাসা থেকে অনুবাদ)

সেনগুপ্ত এণ্ড কোং